শুদ্ধসত্ত্ব বসু

কর্পূরের মতো



কর্পূরের মতো

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
বইমেলা
জানুয়ারী, ১৯৮৬

প্রকাশক :
সুভাষচন্দ্র দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
শম্ভুনাথ চক্রবর্তী
লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস
৪৫-১-এইচ-১৪, মুরারিপুকুর রোড
কলিকাতা ৭০০০৫৪

দাম : ৮ টাকা

১৩৭৫-৭৬ সালের মৌচাকে 'কর্পূরের মতো' উপন্যাসটি যখন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন অনেকেই এই লেখাটি সম্পর্কে আমাকে পত্র লিখে উৎসাহিত করেছিলেন। ছোটদের জন্যে লেখা হলেও বড়রা পড়েও যে এই রচনার কৌতূহল-রসে সন্তুষ্ট হয়েছেন—এ আমার কাছে অতিরিক্ত পাওনা বলেই মনে হয়েছে।

মৌচাকে লেখাটি খুবই দ্রুততার মধ্যে শেষ করতে হয়েছিল। প্রায় তেরো বছর পরে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের সৌভাগ্য লাভ করলো। এই সময় পূর্ব প্রকাশিত লেখাটির সামান্য কিছু সংস্কার-সাধন করা হলো।

এটির প্রকাশনার ব্যাপারে শ্রীসুনীলকুমার মণ্ডলের সহায়তা ধন্যবাদের সঙ্গে অবশ্যই স্মরণীয়; এঁদেরই চেষ্টাতে মৌচাকে প্রকাশিত লেখাটি গ্রন্থাকৃতি লাভ করার সুযোগ পেল। ইতি আষাঢ় ১৩৮৮।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

"ছন্দসী"
১০/৩সি, নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০২৬

কর্পূরের মতো

টাক্লানদা-ই গল্প করছিলেন—আমি যদি নিজে না এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হতুম—তাহলে আমারও বিশ্বাস হতো না। কাল্পনিক ঘটনাও এমন রোমাঞ্চকর হয় না। একটা গোটা স্কুল-বাস ছাত্রবোঝাই অবস্থায় একেবারে লোপাট হয়ে গেল! কি করে যে গেল—তা ভাবাও যায় না। হ্যাঁ—একেবারে কর্পূরের মতোই উবে গেল।

পুরাণে অবশ্য এমন অনেক কাহিনী আছে যা কিনা অলৌকিক বলে বিশ্বাস করানো যায়। যুক্তি বা বিশ্বাসের লগি দিয়ে তল পাচ্ছি না—অলৌকিক বলে একটা লেবেল সেঁটে দিলেই হলো। রামায়ণে যে সীতার পাতাল প্রবেশের কথা আমরা শুনি, সেও ত' তেমনি একটা বিশ্বাসভাজন ঘটনা নয়, বরং সেই ঘটনাকে আমরা অলৌকিক বলেই ভাবি, যেন রূপকথার গল্প।

এই যে স্কুল-বাসটা—ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে স্কুল থেকে ফেরার সময় একেবারে বেপাত্তা হয়ে গেল। পথ থেকে অতগুলো ছেলেশুদ্ধ, বাসটা গায়েব হওয়া কম বিস্ময়কর নয়। বিস্ময়ের কথা কি, বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে হয় না।

তা সে-নিয়ে একটু হৈ চৈ পড়েছিল বৈকি! তবে বড় শহর ত' নয়--যে দেশময় একটা বিরাট সাড়া পড়ে যাবে।

গল্পটা তোদের আদ্যন্ত খুলেই বলি।

গত বছর শীতের সময় আমি ঝরিয়া অঞ্চলে রূপজামে রাতুলদার ওখানে বেড়াতে গিয়েছিলুম। রাতুলদা আমার মেজদার বড় শালা, মাইনিং ইঞ্জিনিয়ানিং পাশ করে একটা কলিয়ারীর ম্যানেজারি করছেন। মস্তবড় কোয়ার্টার—লোকজন বিশেষ নেই। আমাদের

সেখানে প্রায়ই যেতে বলেন। গতবার শীতের সময় হাতেও বিশেষ কিছু কাজ ছিল না, শুধু ধানবাদে একবার একজনের সঙ্গে জরুরী একটা ব্যাপারে দেখা করার দরকার ছিল। এছাড়া হাতে ছিল প্রচুর অবসর। ধানবাদের কাজ সেরে সোজা রাতুলদার ওখানে গিয়ে উঠলুম।

ঝরিয়া থেকে বেশ কিছু দূরে মুথ্‌রাটাঁড়, সেখানে রাতুলদার কলিয়ারী। আর রাতুলদা থাকেন রূপজামের কোয়ার্টারে। মুথ্‌রা-টাঁড় থেকে রূপজাম মাইল পনেরো দূর হবে। মুথ্‌রাটাঁড়ে থাকার বিশেষ সুবিধে নেই--তাই রূপজামেই আশপাশের কয়েকটি কলিয়ারীর ম্যানেজার, ওভারসিয়ার—এই ধরনের কিছু মোটা মাইনের লোকেরা থাকে। রূপজামের পথে আলো আছে, টেলিফোন আছে, পুলিশ-চৌকি আছে। ছোট্ট একটা রূপোলি কলোনির মতোই রূপজামের চেহারা, যেমন ছিমছাম, তেমনই ফাঁকা ফাঁকা।

পাহাড়-ঘেঁষা জায়গা এই রূপজাম। এখান থেকে গোমো-বার-কাখানার রেললাইন বড়জোর মাইল তিনেক হবে। নীল আকাশের তলায় সবুজ গাছে ঘেরা পরেশনাথ পাহাড়ের চূড়ো এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলে স্পষ্টতই চোখে পড়বে এখান থেকে। পাহাড়ী একটা নদীও আছে গ্রামের ওদিকটার শেষপ্রান্তে। গ্রামটার একদিকে বড়ধেমো নামের ওই পাহাড়টি বিরাট চেহারার দৈত্যের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। রূপজামে নিত্যকার বাজার নেই, মাইল দেড়েক দূরে বড়ধেমো পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ফাঁকা খানিকটা যে জায়গা পড়ে আছে, সেখানে হাট বসে সপ্তাহে একদিন করে।

রূপজামের সব ভালো, শুধু একটা অভাব হলো যে এখানে কোনো ভালো স্কুল নেই, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ানো একটা মুস্কিলের ব্যাপার। রূপজাম থেকে হয় কুড়ি মাইল পশ্চিমে রোটাংড়ি-তে, না হয় পূবে পনেরো মাইল দূরে শোংখারো-তে ছেলে-পিলেদের স্কুলে পড়াবার জন্যে পাঠাতে হবে। রূপজামে পড়ুয়া

ছেলে-মেয়েদের সংখ্যা খুব বেশী না—তাই একটা স্কুল এখানে চালানো যায় না।

শোংখারো স্কুলে ইংরাজী পড়ার বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেই, প্রধানতঃ হিন্দীর মাধ্যমেই লেখাপড়া শেখানো হয়। তাই ইংরাজী শিখতে হলে রূপজামের ছেলেদের রোটাংডিতে গিয়ে পড়াশুনো করতে হয়।

রোটাংডি হলো আধা-শহরের মতো, সাধারণ স্কুল আছে দু-তিনটি, ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থায় মোটা মাইনের একটা ভালো অভিজাত স্কুলও আছে। ডাক্তারখানা আছে, বেশ বড় রকমের থানা আছে, দোকান-বাজার তো আছেই। এমন কি, একটা সিনেমা হাউসও আছে—অবশ্য শুধু শনিবার আর রবিবার শো হয়, অন্যদিন শো হলে লোক হয় না।

রোটাংডি-ই হলো রূপজামের কাছাকাছি শহর। রোটাংডি থেকে একটা মাত্রই চওড়া পিচের রাস্তা রূপজামে চলে গেছে। পথে পড়ে তিলুড়ি হ্রদ, সেই তিলুড়ি হ্রদের পাশ দিয়ে মাইল-খানেক পথ যেতে হয়; ফাঁকা রাস্তায় গাড়ী জোরে ছোটে বলে হ্রদের ধারটায় সিমেণ্টের গাঁথনি আর সিমেণ্টের গাঁথনির ওপর লোহার গ্রিলের বেড়া—যাতে চলতি কোনো গাড়ী কোনোরকমে তিলুড়ির জলে গিয়ে না পড়ে, আর পথের মাঝে মাঝে তো কংক্রীট জমিয়ে বেশ উঁচু ধরনের কয়েকটা স্পীড চেকার করে দেওয়া হয়েছে।

তিলুড়ির হ্রদ যেখানে শেষ হয়েছে—তার অল্প দূরেই গোমো যাবার আর একটা রাস্তা এসে রোটাংডি-রূপজামের পথে মিশেছে। এই জায়গাটাকে সকলে তিলুড়ির মোড় বলে। তিলুড়ির মোড়ে খানকয়েক দোকান আছে, একটা বুঝি পেট্রোল পাম্পও রয়েছে।

বোকারো থেকে যারাই পরেশনাথ পাহাড়ের পথে যায়—তাদেরকে এই তিলুড়ির মোড় পার হতে হবেই। একটা চায়ের দোকান

আছে, গাড়ী থামিয়ে অনেকে আবার সেখানে বসে এক পেয়ালা করে চা খেয়েও নেয়।

তিলুড়ি মোড়ের এই চায়ের দোকানটা খুব পুরনো না হলেও সকলেরই চেনা। যে স্কুল বাসটা কর্পূরের মতো উবে গেল—তার জন্যে কিছু উৎকণ্ঠা এই চায়ের দোকানের মালিকেরও ছিল। তার কোনো ছেলে অবশ্য সেই বাসে ছিল না, তবু ওই বাসটার সব ছেলেই ছিল তার বিশেষ চেনা।

ব্যাপারটার শুরু যে কোথা থেকে—তা বলতে পারছি না, তবে ব্যাপারটা যেমন ভয়াবহ, তেমনই রহস্যময়।

আগেই বলেছি—রূপজামের কয়েকটি বাচ্চা ছেলে রোটাংডিতে পড়তে যেতো। একটা স্টেশন-ওয়াগনের ব্যবস্থা ছিল—রূপজাম থেকে জন-দশেক ছোট্ট ছেলেকে সকাল ন'টার সময় রোটাংডির স্কুলে আনা হতো—আর বিকেল পাঁচটায় রূপজামে পৌঁছে দেওয়া হতো। সপ্তাহে পাঁচদিন স্কুল। শনিবার আর রবিবার—এই দু'দিন ছুটি।

একদিন বিকেলে রোটাংডি-স্কুল থেকে স্কুলের গাড়ী বের হয়ে আর রূপজামে ফিরলো না। রোটাংডি থেকে রূপজামে যাবার পথ ঐ একটাই; রোটাংডি থেকে স্কুলের গাড়ী ঠিক সময়মতই বের হয়েছিল, কিন্তু রূপজামের পথে পৌঁছবার আগেই গাড়ীটা একেবারে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল!

হ্যাঁ, ছেলেসুদ্ধুই অদৃশ্য হয়ে গেল।

জন-দশেক ছোট্ট ছেলে সমেত গোটা স্টেশন-ওয়াগন একেবারে লোপাট, অভাবনীয় কাণ্ড, গাড়ীটা উবে গেল, কিভাবে গেল, কোথায় গেল—তা নিয়ে সোরগোল পড়ে গেল। রাতুলদার ছোট বাচ্চাটাও ছিল। বছর আষ্টেক বয়স হবে; সেও ছিল সেদিন ঐ গাড়ীতে! শুধু গাড়ী নয়, গাড়ীর মধ্যেকার ছেলেগুলো, এমনকি গাড়ীর ড্রাইভার পর্যন্ত—একেবারে হাওয়া!

ভারী আশ্চর্য কাণ্ড! রোটাংডি আর রূপজামের মধ্যে একটা গোটা গাড়ী উবে যাবে কি করে? এক হতে পারে—তিলুড়ি হ্রদের জলে গিয়ে ছেলেশুদ্ধ গাড়ীটা যদি ডুবে যায়,—এছাড়া তো গাড়ীটা লুপ্ত হবার আর কোনো ব্যাখ্যা খাড়া করা গেল না! একথা ঠিক যে মঙ্গলগ্রহ থেকে মহাকাশ বেয়ে কেউ এসে ঐ শূন্য পথে গাড়ীটা নিয়ে হাওয়া হয়নি। আর এক হতে পারে—আজকাল তো গাড়ী চুরির হিড়িক পড়েছে, কেউ যদি গাড়ীটা হাপিস করে দেয়, এর পার্টস্ খুলে বিক্রী করতে পারে—সেই লোভ রয়েছে। আজকাল স্পেয়ার পার্টসের দাম খুব বেশী!

আর একটা সম্ভাবনার কথাও মাথায় উঁকি দিচ্ছে—ওই যাকে হাইজ্যাক বলে। বন্দুকের জোরে চলন্ত গাড়ি ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়া—

আমার এক এক সময় মনে হচ্ছে—ওই স্টেশন ওয়াগনের ড্রাইভার কোথাও বনবাদাড়ে গাড়ীটা লুকিয়ে রাখেনি তো? ড্রাইভারের মনে যদি কোনো কু-মতলব থেকে থাকে—

না, না—সকলের ধারণা: ড্রাইভার এই ধরনের কাজ করতেই পারে না, তেমন লোকই নয় সে। ড্রাইভার হলো মাধু সিং, সে গাড়ীটা চালায়—সকালে এক ট্রিপ আর বিকেলে এক ট্রিপ চালিয়ে গাড়ীটা স্কুলে জমা রেখে দিলে তবে তার ছুটি। ডিউটি হিসেবে কাজটা খুবই হাল্কা ধরনের। কাজের তুলনায় মাইনে ভালই পায়। মাধু সিং রোটাংডির লোক; ছোট্ট একটা মোটর মেকানিকের দোকান করেছে সে, মালিকানা তারই; নিজে গাড়ীর কাজ কিছু জানে, এটা-সেটা সেরে-সুরে দিতে পারে, তাছাড়া ভারী কাজ হলে বিহার মোটর সার্ভিস এজেন্সি থেকে মিস্ত্রী ডেকে এনে কাজ করিয়ে নেয়। ভারী ভালো লোক মাধু সিং। সবাই তাকে ভালবাসে।

মাধু সিং-এর বাবা তিনু সিং একদা কোনো এক নামকরা সার্কাস পার্টিতে কাজ করতো। বুড়ো বয়সে কাজ থেকে অবসর নিয়ে

ছেলে, ছেলের বউ, নাতিপুতি নিয়ে আরামে রোটাংডিতে আছে। তিন্নু সিং-ও খুবই ভালোলোক, শুধু ভালো বললে ঠিক বলা হবে না, ভারী মজার লোক এই তিন্নু সিং। যখনই তিন্নু কোনো কথা বলবে—সার্কাস-জীবনের এক-আধটা ঘটনার উল্লেখ করতে ভুলবে না। তিন্নু কখনো কাউকে রূঢ় কথা বলেনি, কারুর সঙ্গে রুষ্ট ব্যবহারও করেনি।

মাধু সিং-ও বাপের মতো, রোটাংডি-তিলুড়ি-রূপজামের কেউ বলতে পারবে না যে মাধু সিং-এর সঙ্গে কোনোদিন কারুর কথা কাটাকাটি হয়েছে। এই অঞ্চলের এমন কেউ নেই যে নাকি মাধু সিং-এর কাছ থেকে উপকার নেয় নি। মাধু সিং-কে যখন যে কাজে যে কেউ ডেকেছে—মাধু সিং হাসিমুখে তক্ষুণি তা করে দিয়েছে। শুধু রোটাংডি কেন, একটু দূরের জায়গা গোমো কি ভুজুডি, এমনকি ঝরিয়া অঞ্চলের লোকের কোনো উপকারে যদি সে আসতে পারে, সে নিজেকে ধন্য মনে করে। উপকার করার ব্যাপারে তার চরিত্রে কোনো খাদ নেই। সে যেমন সবাইকে ভালবাসে, সকলেও তাকে খুব ভালবাসে, সকলেরই সে বিশ্বাসভাজন।

মাধু সিং বিবাহিত, তার বউ আছে, ছোট ছোট দুটো ছেলেও রয়েছে। এই দুই ছেলে-অন্ত তার প্রাণ। এদের ছেড়ে সে বেশী সময় কোথাও থাকতে পারে না।

এ হেন মাধু সিং হলো সেই গাড়ীর ড্রাইভার ; আর রোটাংডির স্কুলের এই ছোট স্টেশন-ওয়াগানটা চালু হওয়ার দিন থেকেই মাধু সিং ড্রাইভারি করে আসছে। তাছাড়া সে ওই দশটা ছেলেকে ভালও বাসে খুব—একেবারে নিকট আত্মীয়ের মতো। ছেলেদের এতটুকু কষ্ট হবে—এমন কাজ সে কখনোই করতে পারে না।

রূপজামের কতটা দূরে আর ঠিক কটার সময় যে স্কুলের ওই গাড়ীটা বেপাত্তা হয়ে যায়—তা-কেউ বলতে পারলো না। তিলুড়ি পেট্রল পাম্পের কাছে প্রতিদিন চারটে বেজে পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ মিনিটের

সময় গাড়ীটা আসে, ঠিক সময়ে স্কুল ছুটি হলে ওখানে আসতে কখনো চারটে চল্লিশ হয়নি, আবার চারটে তিরিশও হয় নি। মাধু সিং সময় রাখার ব্যাপারে এমনি ওস্তাদ ছিল। ফাঁকা রাস্তায় সে বেশী জোরে গাড়ী চালায় না, সময়মতো নির্দিষ্ট জায়গায় না পৌঁছলে সকলের অসুবিধে হবে, সে কথা মাধু সিং-এর খেয়াল আছে।

তিলুড়িতে গাড়ীটা যখন পাঁচটার মধ্যেও এল না—তখন সেখানে লুন্টি কলিয়ারীর ম্যানেজার কৃষ্ণমূর্তি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। কৃষ্ণমূর্তির একমাত্র ছেলে, লুন্টি থেকে এসে তিলুড়িতে সকাল ন'টার সময় স্টেশন-ওয়াগানে তুলে দিয়ে যান কৃষ্ণমূর্তি, আর সাড়ে চারটের সময় এসে ছেলেকে ফেরৎ নিয়ে যান। তিলুড়ি থেকে লুন্টি অন্যপথে যেতে হয়—দূরত্ব প্রায় এক মাইল, কি তার চেয়ে অল্প কিছু বেশী হবে, টানা পিচের রাস্তা আছে।

রোটাংডি থেকে গাড়ী এল না--নির্দিষ্ট সময়ে মাধু সিং গাড়ী নিয়ে হাজির হয় নি—এ রকম ঘটনা এর আগে কখনো ঘটে নি। তিলুড়ি পাম্পিং স্টেশন থেকে কৃষ্ণমূর্তি রোটাংডি স্কুলে ফোন করলেন, ভাগ্য প্রসন্ন ছিল বলা যায়--অন্ততঃ টেলিফোনে লাইন পাওয়ার ব্যাপারে। স্কুল থেকে জানানো হলো যে মাধু সিং ঠিক সময়েই গাড়ী বের করে ছেলেদের নিয়ে রওনা হয়ে গেছে, পথে হয়তো দেরী হচ্ছে কোথাও—এক্ষুণি গিয়ে পড়বে। কিন্তু পথে তো মাধু সিং-এর কোথাও দেরী হবার কথা নয়।

কৃষ্ণমূর্তি নিজের গাড়ী করে এগোতে লাগলেন রোটাংডির দিকে, খুব ধীরে ধীরে গাড়ী চালাতে লাগলেন—পথের চারদিকে চোখ রেখে। স্কুলের স্টেশন-ওয়াগানটা খারাপ হয়ে যেতে পারে, অচল হয়ে কোথাও আটকা পড়েছে, কিম্বা—ভাবতে গিয়ে কৃষ্ণমূর্তির বুক কেঁপে উঠে থাকবে, তিলুড়ি লেকের জলে ডুবে যায় নি তো—তবে সে আশঙ্কা কম, সিমেন্ট আর লোহার গ্রিল দিয়ে জলের দিকটা আটকানো। তবু কৃষ্ণমূর্তি খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে আসতে

বিকেলের পড়ন্ত আলোয় তিলুড়ি হ্রদের রেলিং পরীক্ষা করে দেখলেন—কোথাও কোন এ্যাকসিডেণ্ট ঘটেছে কিনা। না, রেলিং বা সিমেণ্টে কোনো আঁচড় পর্যন্ত লাগে নি। লাইট পোস্ট কি টেলিগ্রাম—টেলিফোনের থাম পর্যন্ত একটুও দোমড়ায় নি, সম্পূর্ণ অটুট আছে।

রোটাংডি থানাতেও খবর করা হলো। থানা হচ্ছে রোটাংডির শেষপ্রান্তে—রূপজামের দিকে আসার পথেই পড়ে। জানা গেল, মাধু সিং রোজ যেমন গাড়ী নিয়ে চারটে পনেরো মিনিটের সময় চলে যায়—তেমনই সময় গেছে। আজ যে গেছে—সে-সম্পর্কে দারোগাবাবু একেবারে নিশ্চিত, কারণ মাধু সিং-এর হাতে পোস্ট অফিস থেকে একটা রেজিস্ট্রি চিঠি থানার দারোগাবাবুকে পাঠানো হয়েছিল—মাধু সিং বিকেলে, এই বেলা চারটে বেজে পনেরো কি ষোলো মিনিটের সময় থানার দারোগাবাবুর সই নিয়ে চিঠিখানি দিয়েছে ; পরে স্টেশন-ওয়াগনটি চালিয়ে মাধু সিং যথারীতি তার নির্দিষ্ট পথ ধরে চলে গেছে—রোজ যেমন যায়। পোস্টঅফিস থেকে থানার বাবুদের চিঠি প্রতিদিন বিকেলে মাধু সিং-এর হাত করেই পাঠানো হয়, আজও তার ব্যতিক্রম হয় নি। থানার কাছ থেকেই এতসব খবর পাওয়া গেল। তবে থানার কাছে মাধু সিং স্কুলের গাড়ী নিয়ে এখনো রূপজামে পৌঁছয় নি—এটা খুব গুরুতর খবর বলে গ্রাহ্য হলো না। রূপজামে মাধু সিং পৌঁছয় নি—তবে পৌঁছে যাবে—এইরকম একটা ভাব আর কি! লোকটা জীবনে যে কোনোদিন পাঁচটা মিনিট পর্যন্ত দেরী করে না স্কুল-বাস নিয়ে ফিরে আসতে—তার এই অভাবনীয় দেরী করার মধ্যে যে বড় রকমের একটা কিছু ঘটে যেতে পারে, কিম্বা ঘটে বসে আছে—এইরকম ভাবাটাই তো স্বাভাবিক।

স্কুলে আবার ফোন করা হলো, এবারও সহজে লাইন পাওয়া গেল। মাধু সিং স্কুল-বাস নিয়ে এখনো ফেরেনি, সারা পথ কৃষ্ণমূর্তি খুঁজে এসেছেন। ওদিক থেকে স্কুলের হেড-ক্লার্ক জানালেন—গাড়ী ত' স্কুল থেকে ঠিক সময়েই বেরিয়েছে, আজ মোট ন'টি ছেলে ছিল মাধু

সিং-এর গাড়ীতে। গাড়ী এখনো না-পৌঁছবার কারণ তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

অভিভাবকেরা সবাই ভাবিত, সবাই ব্যাকুল।

হেড-ক্লার্ক বললেন—স্বাভাবিক, এখনো যদি বাচ্চা ছেলেরা বাড়ী না ফেরে—ভাববার কথা বৈকি! এরকম দেরী ত' এর আগে কখনো হয় নি। আচ্ছা, আপনারা মিনিট পনেরো পরে আবার আমাকে ফোন করুন, আমি এই সময়ের মধ্যে পাশের পোস্ট অফিস থেকে খোঁজ নিয়ে আসছি—মাধু সিং-কে ওরা আজ কি কি কাজ দিয়েছে। পোস্ট অফিসে যে চিঠি আজ আসে—তা পরের দিন বিলি হয়, তাই বিশেষ লোকের চিঠি, থানার চিঠি—দিনের দিন মাধু সিং-এর হাত করেই পাঠানো হয়। আজকের ব্যাপরটা কি হয়েছে—আমি এখনই জেনে আসছি। মিনিট পনেরোর মধ্যেই স্কুলে ফিরে আসবো, তখন ফোন করলেই জানতে পারবেন।

এ-দিক থেকে বলা হলো বটে যে আজ মাধু সিংয়ের কাছে দারোগাবাবুর চিঠি ছিল, যথাসময়ে দারোগাবাবুর চিঠি থানায় পৌঁছে দিয়ে সেখান থেকে গাড়ী নিয়ে বের হয়েছে; তবু হেড-ক্লার্ক বললেন—আমি নিজে পোস্ট অফিসে গিয়ে খোঁজ করছি। রূপজাম, তিলুড়ির চিঠিও মাধু সিং-এর হাত করে কখনো সখনো পাঠানো হয়; এমনকি একবার মুথ-রাটাঁড়ের এক জবরদস্ত ব্যবসাদারের এক জরুরী চিঠি ওর হাতে পাঠানো হয়েছিল—সেবারও মাধু সিংয়ের বাড়ী ফিরতে বেশ দু-তিন ঘণ্টা দেরী হয়েছিল। অবশ্য স্কুলের ছেলেদের পৌঁছে দেবার পর খালিগাড়ি নিয়ে ফিরে আসার একটু বাদেই সন্ধ্যার সময় তাকে এইরকম অনুরোধ করা হয়েছিল, সুতরাং পোস্ট অফিসে খোঁজ নেওয়ার দরকার আছে।

ঠিক আছে, পনেরো মিনিট পরেই আবার ফোন করা হবে।

স্কুলের হেড-ক্লার্ক লোকটি ভালই,—তবে সবকিছু খতিয়ে দেখা, সবকিছু মিলিয়ে নেওয়া তার স্বভাব। একটু খুঁতখুঁতে স্বভাবের

মানুষ তিনি। থানা থেকে যা জানা গেছে—তা নিজের কানে শোনেন নি বলেই ঠিক বিশ্বাস করতে পারেন নি, পোস্ট অফিসে তিনি নিজে গিয়ে জেনে নিতে চান।

পনেরো মিনিট পরে বার কয়েক চেষ্টার পর ফের স্কুলে টেলিফোন করা গেল। এবার হেড-ক্লার্কের গলায় বেশ উদ্বেগের সুর, তিনিই বললেন—সত্যিই ভাবনার কথা। পোস্ট অফিস থেকে শুধু দারোগা-বাবুর কাছে একটা রেজিস্ট্রি চিঠি পাঠানো হয়েছে, এমন ত' প্রায়ই পাঠানো হয়, মাধু সিংকে আর কোনো কাজের ভার দেওয়া হয় নি, আর কোথাও যাবার কথাও নয় তার, সুতরাং চিন্তার কথা। থানা পথেই পড়ে, সেখানে সে চিঠি দিয়েছে, সেখান থেকে ঠিক সময়ে রূপজামের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে—এ-সব যা শোনা গেছে—তা ঠিকই, কিন্তু রূপজামে না গিয়ে সে কোথায় গেল—স্কুলের ওই কয়েকটা কিশোরকে নিয়ে? থানায় দেরী হয় নি, পথেও বলছেন কোনো দুর্ঘটনার চিহ্ন নেই, তাহলে স্কুলের গাড়ীটা গেল কোথায়? কি বলছেন?—তিলুড়ির মোড়েই যায় নি? তাহলে থানা আর তিলুড়ির এই পথটুকুর মধ্যেই স্কুল-বাসটা লোপাট হয়েছে।

স্কুলের হেড-ক্লার্ক অবশেষে জানালেন যে তিনি স্কুলের মাস্টার-মশাইদের খবর দিচ্ছেন, থানাতেও যাচ্ছেন খবর দেবার জন্যে, এবং শেষে তিনি নিজেও খুঁজতে বের হবেন রূপজামের পথে।

রূপজামের লোকেরাও ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। রোটাংডি থেকে স্কুল-বাস ফেরেনি, কোথায় যেন হারিয়ে গেছে—এই খবরটা ছড়িয়ে পড়তে দেরী হলো না। সকলের চোখে-মুখেই নেমেছে উদ্বেগের ছায়া। বাচ্চারা এখনো ফিরলো না। কাল শনিবার, স্কুল ছুটি, হয়তো আজ স্কুলে কোনো ফাংসন হতে পারে—এই ভেবে প্রথমটা রাতুলদা বিশেষ চিন্তিত হন নি, এমন তো আগেও হয়েছে দু-এক শুক্রবার, তবে সেক্ষেত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু আজ কৃষ্ণমূর্তির টেলিফোন পাবার পর থেকেই তিনি বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে

পড়েছেন। কৃষ্ণমূর্তি বহুকাল কোলকাতায় ছিলেন, বাংলা বেশ বলতে ও বুঝতে পারেন, তবে বলার সময় সামান্য একটু টান এসে পড়ে। বাংলাতেই তিনি প্রথম রাতুলদাকে স্কুলের ওই স্টেশন-ওয়াগানটার হারিয়ে যাবার কথা বললেন। পথে বেরিয়ে যে তিনি নিজে দেখে এসেছেন, সারাপথ নিজে গাড়ী করে তন্ন তন্ন করে খুঁজে এসেছেন—তবু স্টেশন-ওয়াগনের টিকি মেলেনি—সে কথাটা জানালেন। সর্বশেষে জানালেন যে ব্যাপারটা মোটেই হাল্কা ধরনের কিছু নয়, এর ভেতর কেমন যেন রহস্য রয়েছে বলে তাঁর মনে হচ্ছে। সুতরাং স্কুলের ছেলেদের কথা ভেবে তাদের অভিভাবকদের উচিত—এখনই একটা কিছু করা। ঘটনাটা সত্যিই রহস্যজনক।

কৃষ্ণমূর্তির প্রত্যেকটা কথাই রাতুলদা শুনলেন। প্রথমটা তিনি কৃষ্ণমূর্তির কথায় গুরুত্ব দেন নি বটে, কিন্তু শেষে বার বার রহস্য কথাটার উল্লেখে তিনি বিচলিত বোধ করলেন। স্কুলের গাড়ী উধাও হবে কি করে? এটা কি সাধারণভাবে কেউ কখনো বিশ্বাস করতে পারে? পথে আসতে আসতে গোটা একটা গাড়ী নিশ্চিহ্ন হতে পারে নাকি? কৃষ্ণমূর্তি যে মিথ্যা বলছেন না—রাতুলদা তাও জানেন।

ঘনায়মান সন্ধ্যার ছায়া যেমন আকাশের ওপর নামতে শুরু করেছে, মূহূর্তে সমস্ত রূপজামে এক ধরনের বিষণ্ণ বিহ্বলতা নেমে এল। সন্ধ্যায় রূপজামের আকাশে বর্ণরঙীন একটা উজ্জ্বলতা থাকে, কিন্তু আজকের এই খবরটা এসে পৌঁছবার পর রূপজামের সান্ধ্য আকাশের বর্ণাঢ্যতা ফ্যাকাশে হয়ে গেল, দুশ্চিন্তার বিবর্ণ ছায়া ভাসতে লাগলো।

এর মধ্যে দু'একটি বাড়ীর মহিলা গলা ছেড়ে কাতর কণ্ঠে চীৎকার করে তাদের বাচ্চার জন্যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করতে শুরু করে দিলে।

রাতুলদা এতক্ষণে ব্যাপারটাকে খুব গভীরভাবে খতিয়ে দেখতে লাগলেন। কৃষ্ণমূর্তির ফোনটা পাবার পর থেকেই মন যে চঞ্চল হয় নি—এমন নয়, কিন্তু ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা হয় নি।

অথচ বাড়ীর মেয়েদের কাতর কণ্ঠের আর্তধ্বনি কানে আসতেই রাতুলদার মনটাও হু-হু করে উঠলো ; সত্যি, ছেলেটা তো এখনও ফেরেনি, সেই কোন্ সকালে স্কুলে গেছে। স্কুলের বাসটার কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না—

রাতুলদা আমাকে নিয়ে বের হলেন তাঁর গাড়ীতে করে। ইতিমধ্যে আরো দু'একটি গাড়ী রোটাংডি-র দিকে চলে গেছে শুনলাম।

তিলুড়ি যখন এলাম—তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। দিনের আলো কিছুটা ঘোলাটে আর ঝাপসা হয়ে নিভতে শুরু করেছে, অন্ধকার নামতে যে আর বেশী দেরী নেই—তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। তিলুড়িতে এসে দেখি—সেখানে এর ভেতরেই দু'একটা গাড়ী এসে জমায়েত হয়েছে। ঐ গাড়ীর অনেক লোক তিলুড়ির মোড়ে নেমে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। সকলের চোখে-মুখে ঐ একই জিজ্ঞাসা—মাধু সিং আর তার গাড়ীর কি হলো ? কি করে খোঁজ পাওয়া যাবে গাড়ীটার ? ছেলেদের ? মাধু সিংয়ের ?

তিলুড়ির মোড়ে পাম্পিং স্টেশনের একেবারে গায়েই বীরুয়ার ছোট্ট একটা চায়ের দোকান ;—বীরুয়া রোটাংডি-রূপজাম-লুন্টি—মানে এধারের যত গ্রাম বা আধা-শহর আছে—সে-সব জায়গার সকলেরই পরিচিত লোক ; বিশ বছর সে এই দোকান চালাচ্ছে। এই পাম্পিং স্টেশন বানাবার সময় সে কুলি হয়ে এ অঞ্চলে আসে, তারপর এখানেই থেকে যায় ; ঐ চায়ের দোকান চালিয়ে কোনোরকমে দিন গুজরান করে। এ-দিককার নাড়ী-নক্ষত্রের খবর তার জানা।

বীরুয়ার দোকানে মাধু সিং রোজ এক খুরি চা খেয়ে যায়। অবশ্য ফেরার সময়। রূপজাম থেকে ফেরার সময় খালি গাড়ী নিয়ে সন্ধ্যার পর যখন মাধু সিং রোটাংডি যায়—তখন সে ঐ দোকানের চা না খেয়ে পারে না, তখন দ্রুততা থাকে না, ধীরে সুস্থে বসে বীরুয়ার দোকানের চায়ে চুমুক না দিলে চলে না। এমনকি বীরুয়ার যদি অসুখ-বিসুখ করে—তবুও ঘুঁটে জ্বেলে মাধু সিং নিজে চা তৈরী

করে, নিজে এক কাপ খাবে আর বীরুয়াকে এক কাপ খাইয়ে চায়ের দাম চুকিয়ে দিয়ে তবে গাড়ীতে উঠবে।

বিকেলে স্কুল থেকে রূপজামের দিকে ফেরার সময়ও তিলুড়ির মোড়ে গাড়ী নিয়ে এসে একটুখানি থামে মাধু সিং। লুন্টি যাবার জন্যে কৃষ্ণমূর্তির ছেলেকে এখানে নামাতে হয়, কোনোদিন যদি কৃষ্ণমূর্তির আসতে একটু দেরী হয়—তবে বীরুয়ার জিম্মায় তাঁর ছেলেকে রেখে মাধু সিং রূপজামে চলে যায়, সময়নিষ্ঠার জন্যে সে কৃষ্ণমূর্তির আসা অবধি প্রতিদিন অপেক্ষা করতে পারে না, স্কুলের তেমন নির্দেশও নয়। বরং স্কুল থেকে কৃষ্ণমূর্তিকে জানানো হয়েছিল যে তিনি যদি সাড়ে চারটের মধ্যে তিলুড়ির মোড়ে না পৌঁছতে পারেন, তবে রূপজাম থেকে ফেরার সময় তিনি তাঁর ছেলেকে নিতে পারবেন। কৃষ্ণমূর্তি তখন জানিয়েছিলেন যদি কোনোদিন তাঁর তিলুড়ির মোড়ে আসতে সাড়ে চারটে বেজে যায়, তাঁর ছেলেকে নামিয়ে দিয়ে যেন বীরুয়ার দোকানে রেখে যায় মাধু সিং। স্কুলের কর্তৃপক্ষের এতে সায় ছিল।

সুতরাং রোটাংডি ছেড়ে থানা পোস্ট অফিস সেরে তিলুড়ির মোড়ই হলো মাধু সিং-এর প্রথম থামার জায়গা, বীরুয়ার চায়ের দোকানে কৃষ্ণমূর্তির ছেলেকে নামিয়ে দিয়েই মাধু সিং বাস নিয়ে রূপজামে চলে যায়, বেশীক্ষণ দেরী করা চলে না, ছোট ছোট ছেলে—এদের বাড়ী ফেরানোর দায়িত্ব তার ওপর, তাই কোথাও অকারণ কালক্ষেপ করা চলে না।

যেহেতু তিলুড়ি পাম্পিং স্টেশনের ধারে বীরুয়ার চায়ের দোকানের কাছে মাধু সিং গাড়ী নিয়ে দাঁড়ায়, তাই ওখানে উদ্বিগ্ন মানুষের ভিড় হওয়া আশ্চর্যের বা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বীরুয়ার কাছেই মাধু সিং-এর ঠিক খোঁজ-খবর পাওয়া যাবে। সকলের তাই বীরুয়ার কাছেই প্রশ্ন—মাধু সিং-এর খবর কি? স্কুলের গাড়ী নিয়ে কি এসেছে সে? কেন আসেনি, কখন আসবে—বীরুয়া কিছু জানে কিনা!



বীরুয়া বললে—আজ তো গাড়ী এখনো রূপজামে যায় নি বাবু। মাধু সিং এখনো আসে নি।

আসে নি তো বোঝাই যাচ্ছে, কিন্তু আসতে এত দেরী করছে কেন মাধু সিং?

বীরুয়াও কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে উত্তর দিলে—মাধু সিং কখনো তো এমন দেরী করে না বাবু—তবে কি না, আজ এখনো স্কুল থেকে গাড়ী আসে নি।

ঠিক বলছিস?

ঠিক বলবো না তো কি আপনাদের কাছে মিথ্যা বলবো?

তুই কি সব সময় চোখ পুঁতে বসেছিলি?

না, তা অবশ্য বসে থাকিনি, কিন্তু যতদূর জানি, মাধু সিং এখনো এখানে স্কুলের গাড়ী নিয়ে আসে নি।

তুই হয়তো অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলি, সেই ফাঁকে মাধু সিং-এর গাড়ী বেরিয়ে গেছে।

না গো বাবুমশায়, তা হয় নি। আমি আজ নজর রেখেছি খুব জোর—এই দেখেন বাবু, এই তরিতরকারি—এগুলি রূপজামে সেনবাবুর বাড়ীতে পৌঁছুতে হবে। সেনবাবুর বাগান আছে ভোজুডিতে, সেই বাগান থেকে ওনার ছোট ভাই এগুলি পাঠিয়েছেন—ওনার বাড়ী পৌঁছে দিতে। আমার দাদা ওনার বাগানের মালী—চাষবাসের কাজকর্ম করে; তিনটে বাজবার একটু আগে ডাকগাড়ীর বাবুর মারফৎ আমার কাছে ভেজে দিয়েছে। তাই আজ আর অন্য কোনোদিকে মন দিই নি,—শুধু তাকিয়ে আছি কখন ফুক করে মাধু সিং আসবে, শুধু সেদিকে নজর রাখছি। মাধু সিং-এর হাত করেই সেনবাবুর বাড়ীতে এই সব্‌জি পাঠাতে হবে।

মাধু সিং-এর গাড়ী যেতে তুই তাহলে দেখিস নি বলছিস?

না, বাবু, রোটাংডি থেকে মাধু সিং গাড়ী নিয়ে এখনো এখানে আসে নি বাবু?

স্টেশন-ওয়াগন নষ্ট হয়ে যেতে পারে মাঝ-পথে, তাই অন্য কোনো গাড়ীতেও আসতে পারে। এই ভেবে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—অন্য কোনো গাড়ী যেতে দেখেছো ?

একটু ভেবে নিয়ে বীরুয়া বললে—অন্য গাড়ী দু'একটা গেছে, কিন্তু বাবু, বাচ্চাদের নিয়ে কোনো গাড়ী এদিকে আসে নি ; মাধু সিং তো আসেই নি। আমি আজ বিলক্ষণ নজর রাখছি, মাধু সিংকে আজ আমার দরকার।

অন্য যে গাড়ী গেছে—তাতে মাধু সিং বা স্কুলের কোনো ছেলে-টেলে ছিল না তো ?

অন্যদিনের তুলনায় আজ গাড়ী গেছে খুব কম। রোটাংডি হাসপাতালের ডাক্তারবাবুর গাড়ী গেছে, লুন্টি কোলিয়ারীর গোটা দুই গাড়ী দেখেছি, কাঁচাকয়লা বোঝাই লরিও একটা গেছে। আর একটা ভ্যান গেছে—বেশ বড় রকমের। এছাড়া, দুপুরের দিকে ধানবাদের পুলিশের গাড়ীকেও যেতে দেখেছি লুন্টির দিকে। —এইসব গাড়ী ছাড়া—আর কোনো গাড়ী চোখে পড়ে নি।

তুই কি বসে বসে গাড়ী গুনছিলি নাকি ?

না, বাবু, ঠিক গাড়ী গুনতে বসি নি। আমাকে আজ সতর্ক থাকতে হয়েছে—মাধু সিং-এর মারফৎ সেনবাবুদের বাড়ী তরকারী পাঠাতে হবে রূপজামে। সেজন্যে গাড়ীর দিকে নজরটা আজ একটু বেশী দিতে হয়েছে। তাছাড়া, কি জানেন বাবু—এইরকম ফাঁকা জায়গায় কোনো গাড়ী এলে বা চলে গেলে চোখ আপনা থেকেই সেদিকে যায়, মাঝে মাঝে তো গাড়ী আসে,—তাই চোখে পড়ে। আর এদিকের সব গাড়ীই প্রায় আমার চেনা, কচিৎ অচেনা লোকের গাড়ী যায় এক-আধটা।

ধানবাদ-পুলিশের গাড়ী কেন গিয়েছিল আজ—সে সম্পর্কে একবার খোঁজ করার কথা মনে হলো, কিন্তু বীরুয়ার কথা থেকে জানা গেল যে পুলিশের গাড়ীটা গেছে দুপুরবেলায়, সুতরাং ওই গাড়ীর সঙ্গে

স্কুলের ছেলেদের কোনো যোগ নেই। চারটে পর্যন্ত স্কুলেই ছেলেরা ছিল, থানাতেও মাধু সিং গেছে সময় মতো—সওয়া চারটে নাগাদ—এ পর্যন্ত সব ঠিক ছিল।

বীরুয়াকে আমি আর একটা প্রশ্ন করলাম—এখান দিয়ে যে সব গাড়ী যায়, সে সব গাড়ী এখানে থামে, না সরাসরি চলে যায়?

প্রশ্নটা করেই বুঝলাম যে একটু বোকা ধরনের প্রশ্ন করে ফেলেছি। অন্য গাড়ী এখানে বিনা প্রয়োজনে থামতে যাবে কেন? বীরুয়াও প্রায় সেইরকমই জবাব দিলে—সব গাড়ী এখানে থামে না, কখনো কখনো পেট্রল নিতে গাড়ী থেমে যায়, গাড়ীর কোনো লোকের চা খাওয়ার দরকার হলে এই অধমের দোকানে আসে। তবে গাড়ীগুলি খুব জোরে চলে না এখান দিয়ে, একটু আস্তে করে দেয়। কোনো কোনো গাড়ী আবার হুস করে বেরিয়েও যায়।

এমন সময় হঠাৎ কৃষ্ণমূর্তি রোটাংডি থেকে ফিরলেন, তাঁর চোখ তুটো ছল ছল করছে। সন্ধ্যার অন্ধকারেও চোখের কোণের জল চিক চিক করছে দেখা যাচ্ছিল। ছেলের খোঁজে ঘুরছেন, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো সন্ধান পান নি তিনি।

তিলুড়ির মোড়ে কৃষ্ণমূর্তি এসে পড়ার পরই আর একটা গাড়ী সামনের হেডলাইট জ্বালিয়ে খুব জোরে ছুটে এসে বীরুয়ার দোকানের সামনে হঠাৎ থামলো, তা থেকে নামলেন রোটাংডি থানার দারোগা-বাবু। স্কুলের হেডক্লার্কের কাছে প্রথমে খবর পেয়ে এবং পরে ঐ স্কুলের হেডমাষ্টার মশাই এসে ডায়েরী করে যাওয়ার পর এবং মাষ্টার মশাই-এর বিশেষ অনুরোধে দারোগাবাবু এই কেসটা হাতে নিয়েছেন। হারানো স্কুলবাসটা খোঁজ করার দায়িত্ব অবশ্যই তাঁর, তবে তিনি দ্বিতীয় অফিসারকে দিয়ে এই কাজটা করাতে পারতেন। কিন্তু স্কুলের হেডক্লার্ক একেবারে হাতে পায়ে ধরে পড়ার মতো অনুরোধ করতে থাকায় দারোগাবাবু নিজেই তদন্তে বেরিয়েছেন। এমন একটা অভূতপূর্ব ব্যাপারে পুলিশেরই তো দায়িত্ব, হারানো জিনিস খুঁজে বের

করা পুলিশের কাজ—আর সে কাজে ঝঞ্চাট-ঝামেলা যাই থাক, আনন্দও কিছু আছে।

হেডমাষ্টার মশাইও দারোগাবাবুর সঙ্গে আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর শরীরটা ভালো নেই, সর্দিজ্বর হয়েছে, তাই তাঁকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে রোটাংভিতে রেখে দারোগাবাবু একাই চলে এসেছেন। এতগুলি বাচ্চা ছেলে ছিল স্কুলবাসে, মাধু সিং রয়েছে। মাধু সিং যে অত্যন্ত সৎ আর সকলেরই বিশ্বাসভাজন—একথা সকলের যেমন জানা, দারোগা-বাবুও তা জানেন। তাই প্রথমটা স্কুলবাস লোপাট হবার সংবাদ পেয়ে তিনি ব্যাপারটাকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবেন নি। বিশ্বাসী মাধু সিং ছেলেদের নিয়ে এদিক ওদিক কোথায় বেড়াতে নিয়ে গেছে, কাল পর্শু ছুটি—ছেলেদের বাড়ী ফিরতে একটু দেরী হলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না। মাধু সিং ছেলেদের ভালবাসে, সে যখন গাড়ী চালাচ্ছে—তখন কারো কোনো ক্ষতি হবে না—এ বিশ্বাস দারোগাবাবুর আছে।

দারোগাবাবুর ছেলেও একদা ওই স্কুলে পড়েছে, তখনই দারোগা-বাবু লক্ষ্য করতেন শুক্রবার হলেই স্কুলে হয় কোনো শিক্ষামূলক বক্তৃতা হতো, না হয় চরিত্রগঠনের জন্যে নীতিকথা শোনানো হতো—যাকে মরাল ক্লাশ বলা যেতে পারে। আবৃত্তি শেখানোর ক্লাশও হতো মাঝে মাঝে, ফলে কোনো কোনো শুক্রবার ছুটির পর ছাত্রদের বাড়ী ফিরতে এক আধ ঘণ্টা দেরী হতো। প্রথমটা তাই দারোগাবাবু বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। কিন্তু হেডমাষ্টার মশাই আর ঐ হেডক্লার্ক—এঁদের উদ্বেগ লক্ষ্য করে এবং গাড়ীটা কোথায় হারিয়ে যেতে পারে—তার মাথামুণ্ডু কিছুই ঠিক করতে না পেরে খোঁজে বেরিয়ে পড়েছেন।

তিলুড়ির মোড়ে ব্যাকুল মানুষের ভিড়, সকলের মুখেই করুণ জিজ্ঞাসা—কোথায় গেল স্কুলবাসটা, কি হবে এখন!

দারোগাবাবুই বললেন—আপনাদের মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি ভাবছি—ওই স্টেশন ওয়াগনটা—অতগুলো

বাচ্চাদের নিয়ে লোপাট হয়ে যাবে বেমালুম—পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে—এ কিরকম করে সম্ভব ?

জেরায় বীরুয়া বার বার ঐ এক কথাই বললে—মাধু সিং ফেরেনি ছেলেদের নিয়ে, রোটাংডি থেকে আসেই নি।

দারোগাসাহেবও একটু ভাবিত যে না হয়েছেন, এমন নয়। তিনি আস্তে আস্তে বললেন—এ ব্যাপারটা এখন সম্পূর্ণ আমাদের দায়িত্বে এসে গেছে। স্কুলবাসটা বিকেল সওয়া চারটে অবধি দেখা গেছে, আমিই দেখেছি নিজের চোখে। অন্যদিন হলে অন্য কথা, আজ মাধু সিং আমার কাছে একখানা রেজিস্ট্রি-করা চিঠি পৌঁছে দেয়—তখন বেলা চারটে বেজে পনেরো-কুড়ি হবে। মাধু সিং আমার সই নিয়ে চিঠিখানা আমার হাতে দিয়ে আমাকে সেলাম ঠুকে বেরিয়ে গেল, আমি জানলা দিয়ে দেখলাম, স্কুলবাসটা চালিয়ে সে তিলুড়ির দিকে চলে গেল। বাসের মধ্যে ছেলেরাও যথারীতি রয়েছে, যেমন রোজ থাকে। এই কিছুক্ষণ আগের কথা ; দশ-বিশ মিনিটের মধ্যেই তিলুড়ির মোড়ে এসে পড়বার কথা, অথচ এখনো মাধু সিং-এর দেখা নেই।

শুধু দেখা নেই—নয়, স্কুলবাসটার কোনো খোঁজ নেই—কৃষ্ণমূর্তি বললেন।

দারোগাবাবু শুধোলেন—এদিক ওদিক খোঁজা হয়েছে ? মানে আমি বলছি পথের ধারে, কোথাও টায়ার পাংচার হয়েছে কিনা,—

বাধা দিয়ে কৃষ্ণমূর্তি ভিজে ভিজে গলায় বললেন—আমি তো দু-তিনবার রোটাংডি আর তিলুড়ির পথটা তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। কোথাও কোনো চিহ্ন নেই। সোজা একটা মাত্র রাস্তা—কোথায় বা হারাতে পারে স্টেশন ওয়াগানটা—

রাতুলদাও ব্যথিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—পথের ধারে কোনো জংগল-টংগলে গাড়ী নিয়ে মাধু সিং আটকে পড়ে নি তো ?

আটকে পড়বে কেন ? কিসে আটকাবে ? কেই বা তাকে

আটকাবে? এখানে তার গাড়ী আটকাবার মতো কোনো লোক নেই—দারোগাবাবু একটু লঘু স্বরে বললেন। তিনি আরো বললেন—অবশ্য মাধু সিং যদি ছেলেশুদ্ধ গাড়ীটা নিয়ে হাওয়া হয়—তবে ত' কথাই নেই।

অন্য একজন বললেন—মাধু সিং কি তা করবে? এমন বিশ্বাসী লোক—

আমি বললাম—বিশ্বাসী বলে কোনো কথা এখন আর নেই!

দারোগাবাবু বললেন—তা যা বলেছেন, বিশ্বাস-টিশ্বাস সব গত শতাব্দীর বস্তু হয়ে গেছে, তবে কিনা মাধু সিংকে আমরা এখনো অত্যন্ত বিশ্বাসী বলেই জানি। একটাও অবিশ্বাসের কাজ সে করেছে —এমন নজির আজ পর্যন্ত কেউ দেখাতে পারে নি। আপনাদের মনে হচ্ছে জংগল-টংগলে আটকা পড়েছে। একগাড়ী ছেলেশুদ্ধ সে জঙ্গলে ঢুকবে কেন? এর পেছনে তার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? অন্য কোথাও যদি গিয়েই থাকে, তবে কোন্ পথ দিয়ে গেল? আমাদের অর্থাৎ পুলিশের কাছে কোনো কাজের পেছনে আগে একটা উদ্দেশ্য খুঁজে বের করার চেষ্টা হয়। মানুষ উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো অন্যায় করে না। পুলিশের ভাষায় এই উদ্দেশ্যকে মোটিভ বলে। মাধু সিং-এর কি মোটিভ থাকতে পারে—যার জন্যে এতগুলো ছেলেকে নিয়ে সে নিজে হাওয়া হবে?

কৃষ্ণমূর্তির কণ্ঠে কান্না চাপবার করুণ আর্তি লক্ষ্য করা গেল। যখন সে বললে—তা হলে সে যাবে কোথায়? ছেলেরাই বা কোথায় গেল?

রাতুলদাও বিষণ্ণ কণ্ঠে খুব নীচু গলায় বললেন—স্টেশন ওয়াগনটাই বা গেল কোথায়? রাস্তা ত' একটা—রোটাংডি থানা থেকে এই তিলুড়ির মোড়ও ত' বেশী পথ নয়।

এইরকম একটা দারুণ বিপদেও দেখলাম—একই কথা, একটা দুশ্চিন্তাই শুধু বার বার ঘুরে আসছে। সমস্যা বা সমাধানের পথের

কোনো ইঙ্গিত নিয়ে কেউ কোনো কথা বলছেন না, এমন কি দারোগাবাবু পর্যন্ত।

দারোগাবাবু কোন্ জায়গা থেকে তদন্ত শুরু করবেন তা এখনো বোধহয় ঠিক করেন নি। তিনি এখানে এই সব ব্যাকুল অভিভাবকদের মধ্যে এসে কিছুটা তুর্ভাবিত হয়েছেন বলে মনে হলো। কিন্তু গাড়ীটা যাবে কোথায়! এই পথটুকুর একদিকে হ্রদের জল, অন্যদিকে জঙ্গল। হ্রদের দিকে কংক্রীট আর গ্রিলের বেড়া। মাধু সিং-এর গাড়ী যদি জঙ্গলে গিয়ে ঢোকে, স্টিয়ারিং বেচাল হয়ে পড়ে—তাহলে তো ছেলেরা চ্যাচাবে, আমি খুব ধীরে ধীরে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে এসেছি,—কোথাও কিছু চোখে পড়ে নি।

কৃষ্ণমূর্তি মাদ্রাজী টানে ইংরাজীতে যা বললেন—তার সরলার্থ হলো যে তিনিও গোটা রাস্তাটা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখেছেন, তিলুড়ী হ্রদের পাশে যে কংক্রীট আর গ্রীলের পাঁচিল—তাও গোটাটা তিনি চোখ বুলিয়ে এসেছেন, গ্রিল অটুট অক্ষত আছে।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন বললেন—কোনো য়্যাকসিডেন্ট তো হতে পারে ?

তা হতেই পারে, তা হলেও তো পথের ওপর তার চিহ্ন থাকতো, এমন কি আশেপাশে যদি পড়েও গিয়ে থাকে, তারও চিহ্ন থাকবে। রাস্তার ধারে গাড়ি পড়ে গেলে বা উল্টে গেলে—এই ঘন্টাখানেকের কি ঘন্টাদেড়েকের মধ্যে—কোনো চিহ্ন থাকবে না ?

তা ঠিক !—দারোগাবাবু ঠিকই বলেছেন।

কৃষ্ণমূর্তি করুণ কণ্ঠে বললেন—আমি খুব নিবিষ্ট মনেই দেখেছি। দুধারেই দেখেছি ; আমার প্রথম ভয় হয়েছিল--গাড়ীটা বুঝি তিলুড়ির জলের ভেতর গিয়ে পড়েছে। আর তিলুড়ির হ্রদ যা গভীর ! সেই ভয় করে আমি পথটাও ভালো করে লক্ষ্য করেছি--রাস্তায় কোথাও দাগ নেই, এতটুকু আঁচড় পর্যন্ত নেই !

এ কথা শুনেই সকলে সমবেতভাবে যেন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন,

বেদনায় আমারও মনটা টন-টন করে উঠলো। রাতুলদার মুখটাও কেমন যেন চাপা কান্নায় ভরে এল, বর্ষার মেঘলা আকাশের মতো।

দারোগাবাবু বললেন—ঠিক এই মুহূর্তে এইরকম সন্দেহ যে আমার হচ্ছে না—তা নয়, তবে জলের দিকের পাঁচিল, রেলিং, পোস্ট—কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। আমিও আসার সময় ভালো করেই তা দেখেছি। কিন্তু ঘুরে ঘুরে শুধু একটা প্রশ্নই মনে জাগছে—গাড়ীটা গেল কোথায়? ছেলেগুলোরই বা কি হাল হচ্ছে?

ছেলেদের কথা উঠতেই সকলের মনে আবার বেদনার একটা হল্কা বয়ে গেল। সময়মতো বাড়ী ফিরতে না পেরে ছেলেরাও এতক্ষণে নিশ্চয়ই কান্না জুড়ে দিয়েছে।

দারোগাবাবু বলতে লাগলেন—মাধু সিং-এর কোনো মোটিভের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না, তাই সে কোনো অপরাধ করেছে বলা যাবে না। তাছাড়া রোটাংডি থেকে বেরিয়ে মাধু সিং ত' গাড়ী নিয়ে তিলুড়ি আসে নি—বীরুয়া ত' বার বার সেই কথাই বলছে।

আমার প্রশ্ন : বীরুয়া যে সকলের কাছে সত্যি কথা বলছে তার কোনো প্রমাণ আছে? সে তো মিথ্যেও বলতে পারে।

কৃষ্ণমূর্তি বললেন—আমি আজ এখানে ঠিক সওয়া চারটে থেকে অপেক্ষা করছিলাম। অন্যদিনের চেয়ে বেশ খানিকটা আগেই আমি এসে পড়েছিলাম। তাই বলতে পারি চারটের পর মাধু সিং গাড়ী নিয়ে তিলুড়ি আসে নি। এ সম্বন্ধে কোনো সংশয় নেই।

দারোগাসাহেব বেশ বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বললেন—তা হলে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে রোটাংডি আর তিলুড়ির মধ্যেই স্টেশন ওয়াগনটি হারিয়েছে।

তিলুড়ির মোড়ে যে ক'জন উদ্বিগ্ন অভিভাবক ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন মিঃ বিশ্বাস বলে এক ভদ্রলোক। তিনি আগে লেবার কনট্রাক্টর ছিলেন, এখন একটা প্রাইভেট কলিয়ারীতে চাকরী

পেয়েছেন, রূপজামে থাকেন, যেটুকু তাঁর সামর্থ্য—তার চেয়ে অন্ততঃ শতগুণ বাড়িয়ে তাঁর পরিচয় দেবার চেষ্টা তিনি করেন। খাঁটি চালিয়াত চন্দর বলতে যে ধরনের মানুষ বোঝায়, মিঃ বিশ্বাসকে ঠিক সেই জাতীয় লোক বলা যায়। রোটাংডি স্কুলে তাঁরও ছেলে পড়ে, সেও ওই স্টেশন ওয়াগনে করে যাতায়াত করে, আজ এখনো সে ফেরে নি। মিঃ বিশ্বাস নিশ্চয়ই সে জন্যে ভাবছেন, কিন্তু মুখে বললেন—দার্জিলিং কি কার্সিয়াঙে ভালো ইংরিজি মিডিয়ামের রেসিডেন্সিয়াল স্কুল আছে, ছেলেকে সেখানে পড়ালেই দেখছি—এই সব ঝামেলা পোহাতে হতো না।

এ-কথায় বিশেষ কেউ কান দিলে না, আমার কেবল একটু রাগ হলো : এ সময় বড় বড় কথা শুনলে গায়ে জ্বালা ধরে যায়।

নিজের কথাটা যে বেশ খানিকটা বেখাপ্পা হয়েছে--এটা বুঝতে মিঃ বিশ্বাসের দেরী হলো না। তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন—বড়ধেমো পাহাড়ের ওদিকটায় যায় নি তো—অন্ধকারে হয়তো পথ হারিয়েছে—

রাতুলদা বললে—মাধু সিং পথ হারাবে কি? তাছাড়া বড়ধেমো যেতে গেলেও তো তাকে তিলুড়ি আর লুন্টি হয়ে যেতে হবে। তিলুড়িতে তাকে আসতেই হবে।

দারোগাবাবু বললেন—না, মাঠঘাট দিয়েও যে যাওয়া না যায়—তা নয়, তবে গাড়ী নিয়ে যাওয়া অত সহজ নয়। তিলুড়ি হ্রদের উল্টো দিকে যে ভুম্‌লির জঙ্গল আছে--ওখান দিয়ে পায়ে হেঁটে দেহাতী লোকজন কখনো কখনো যায় বটে। মোটর গাড়ী নিয়ে ও-পথে কেউ যাবে বলে মনে হয় না। মাধু সিং-তো নিশ্চয়ই যাবে না। আর সে যাবেই বা কেন, মোটিভ কি। মোটিভ ছাড়া কেউ কোনো কাজ করে না—এ আমার দৃঢ় ধারণা।

আমি বললাম—এমনও হতে পারে রোটাংডিতে আপনার হাতে চিঠি দিয়ে মাধু সিং রোটাংডিতেই ফিরে গেছে, ওখানে কোনো ব্যাপারে আটকা পড়েছে—

রাতুলদা বললেন—কাল শনিবার, আজ হয়তো সিনেমা হলে ওদের জন্যে স্পেশাল কোনো ছবি দেখানো হচ্ছে। গত বছর ক'দিন তো এ রকম হয়েও ছিল—

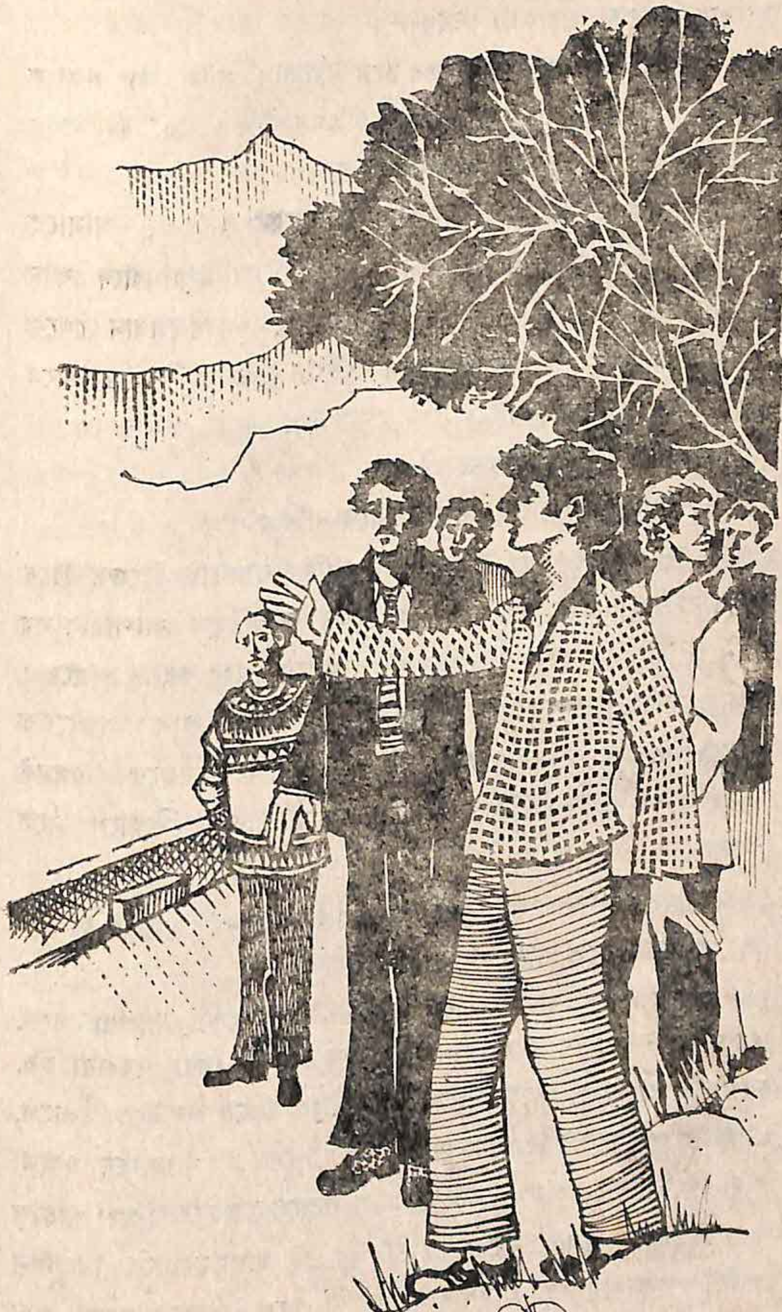
কৃষ্ণমূর্তি বললেন—গত বছর যখন হয়েছিল তখন তার আগে গার্জেনদের জানানো হয়েছে। যাদের বাড়ীতে টেলিফোন আছে, তাদের ফোন করে জানানো হয়েছিল। আমি আজ স্কুলে গিয়েছিলুম, সেরকম কোনো প্রোগ্রাম নেই ;—শুনছেন না স্কুলের হেডমাস্টার মশাই, হেডক্লার্ক—সবাই আমাদের মতো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

তাহলে ?

তাহলে স্টেশন ওয়াগন কোথায় গেল ? গাড়ীটা রোটাংডি ছেড়েছে চারটে বেজে পনেরো মিনিটে, তিলুড়ি আসার কথা ঠিক তার সতেরো-আঠারো মিনিটের পরে—অথচ তিলুড়ির এ ধারে কোথাও গাড়ী দেখা যায় নি, তাহলে কোথায় গেল গাড়ীটা ? দারোগাসাহেব নিজের চোখে দেখেছেন—রোটাংডি থেকে তিলুড়ির দিকে গাড়ী ছেড়ে গেল, ড্রাইভারের সীটে বসে মাধু সিং যথারীতি গাড়ী চালাচ্ছে, ছেলেরাও গাড়ীর ভেতরে গল্পগুজব করছে—রোজ যেমন করে। আবার এদিকে এই তিলুড়ির মোড়ে কৃষ্ণমূর্তি সওয়া চারটে থেকে অপেক্ষা করছেন, বীরুয়াও চেয়ে আছে মাধু সিং গাড়ী নিয়ে কখন আসবে, সেনবাবুদের জন্যে রাখা তরিতরকারীগুলো মাধু সিং-এর হাত করে পাঠাতে হবে রূপজামে—অথচ মাধু সিং গাড়ী নিয়ে এল না—গেল কোথায় গাড়ীটা ? খোঁজাও তো কম হলো না !

রাতুলদা বললেন—চলুন একবার রোটাংডিতে মাধু সিং-এর বাড়ীতে খবর নেওয়া যাক, গাড়ী নিয়ে সে বাড়ীতেও তো ফিরতে পারে।

বিষণ্ণ গলায় কৃষ্ণমূর্তি বললেন—বাছাদের না জানি কত খিদে



পেয়েছে, হয়তো কান্নাকাটি করছে—

এ কথায় সকলের মনটা কাতর হয়ে উঠলো। সত্যি, কত সকালে দু-মুঠো খেয়ে ওরা স্কুলে যায়, কি আর এমন টিফিন নেয়, টিফিনের সময় খাওয়ার চেয়ে ওরা খেলতেই বেশী ব্যস্ত থাকে।

দারোগাবাবু বললেন—আপনারা এগোতে পারেন; আমাকে এখানে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। আমি ধানবাদে ফোন করে রাজ্য-গোয়েন্দা বিভাগের সাহায্য চেয়েছি, এক্ষুণি সেখান থেকে কয়েকজন আসবেন, আমাকে এখানে এই তিলুড়ি পাম্পিং স্টেশনে অপেক্ষা করতে বলেছেন।

গোয়েন্দা পুলিশ?

চুরি-ডাকাতির কোনো ব্যাপার আছে নাকি?

কি জানি, কিছু তো বুঝে উঠতে পারি নি, তাই নিজের কাঁধে সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাখিনি, বড় কর্তাদের ফোন করেছিলুম ব্যাপারটা সব জানিয়ে, তাঁদের নির্দেশেই গোয়েন্দা পুলিশকে খবর করতে হয়েছে। তিলুড়ি-রোটাংডি-রূপজামকে কেন্দ্র করে অন্ততঃ খান পঞ্চাশেক গ্রামের ভেতর খোঁজ করার নির্দেশ এসেছে, সেজন্যে এখনই বিস্তর পুলিশ এসে পৌঁছবে।—দারোগাসাহেব এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন।

গ্রামের ভেতর গাড়ী নিয়ে মাধু সিং যাবে কেন? এতেই বা তার কি মোটিভ থাকতে পারে?

চম্বলের এক থানায় এই ধরনের একটা কেস পাওয়া গেছে, এক টুরিস্ট পার্টির এক বাস যাত্রীশুদ্ধ গায়েব করে দেওয়া হয়, ড্রাইভার রাজপথ ছেড়ে দিয়ে এক গাঁয়ে গিয়ে বাসটাকে তোলে, সেখানে এক ডাকাতের কাছে সবাইকে বেচে দেয়। মানুষ যে এখনো পণ্য হিসেবে কেনাবেচার সামগ্রী—তা চম্বলের জঙ্গলে কিম্বা পাহাড় অঞ্চলে গেলেই বোঝা যাবে। তারপর ওই মানুষগুলোকে কিছুদিন বন্দী করে রাখার পর পৃথিবীর কয়েকটি দেশে গোপনে চালান করা

হয়। ক্রীতদাস প্রথা এখনো যে সভ্যজগৎ থেকে একেবারে চলে যায় নি—এর দ্বারা সেটাই প্রমাণ হয়। বয়স্ক মানুষদের চেয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দাম আরো বেশী পাওয়া যায়। তাই এদিকটাও আমাদের মনে রেখে অনুসন্ধানের কাজে লাগতে হবে।

আমি চুপ করে শুধু শুনে গেলাম। ব্যাপারটা যে খুব গুরুতর ধরনের—তা বুঝতে দেরী হয় নি। হারানো স্কুলবাসে রাতুলদার ছেলেটি রয়েছে—সেজন্যে মনে আদৌ শান্তি পাচ্ছিলাম না। তাছাড়া এতগুলো ছোট বাচ্চা—সেই কোন্ সকালে বেরিয়েছে বাড়ী থেকে, এতক্ষণ মা-বাবা ছেড়ে, বাড়ী ছেড়ে রয়েছে, কি যে হাল হয়েছে তাদের, ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে যায়, বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে।

তখনই খান-তিনেক গাড়ী ছুটলো রোটাংডির দিকে, একটা গাড়ীতে রাতুলদা আর আমিও গেলাম। মাধু সিং-এর বাড়ীতে একবার খোঁজ নেওয়া দরকার, এবং তা যত তাড়াতাড়ি নেওয়া যায়—ততই ভালো।

গাড়ীটা হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপার এমনই অস্বাভাবিক যে সুস্থ মাথায় কিছু ভেবে ওঠা যাচ্ছে না। দারোগাবাবু যে বললেন ধানবাদ থেকে গোয়েন্দা পুলিশ আসছে—এতে ব্যাপারটা এবার বেশ ঘোরালো মনে হলো। অথচ পুলিশ যে কি সন্দেহ করেছে—বা এই বিষয়টা খোঁজ করার কোন্ পথ নিয়েছে—সে-সব কথা জানবার উপায় নেই, তবে এই অঞ্চলের পঞ্চাশ-পঞ্চান্নখানা গ্রামে ঘুরে ঘুরে মাধু সিং আর তার চালানো স্টেশন ওয়াগন খোঁজ করা হবে—এই শুনেই তো বোঝা যাচ্ছে—ব্যাপারটা সাধারণ নয়।

মাধু সিং সম্পর্কে সকলেরই ধারণা ভালো, ধোওয়া তুলসী পাতার মত পবিত্র বলে তাকে গণ্য করা হচ্ছে। সে এই ধারণার সুযোগ নিচ্ছে না তো? ছেলেগুলোকে আটকে রেখে পরে টাকা দাবী করা হবে না তো?

আজকাল ছেলে-ধরার যা হিড়িক—কোনো একটা দলের সঙ্গে যে

বেশ মোটা টাকার বদলে মাধু সিং কোনো একটা ব্যবস্থায় আসে নি, তাই বা কে বলতে পারে?

মাধু সিং সম্পর্কে সকলে যতই প্রশংসার কথা বলুক না কেন—বাতুলদার মনে কিন্তু এই লোকটি সম্পার্কে কোনো ধারণাই ছিল না, শুধু শোনা গেছে যে মাধু সিং লোক ভালো, অবশ্য তার বিরুদ্ধে কোনো দুষ্কার্যের কোনো প্রমাণ নেই।

মাধু সিং-এর বাড়ী খুঁজে বের করতে একটুও দেরী হলো না। রোটাংডিতে যাকেই জিজ্ঞাসা করা যাক, সকলেই ছোট বাড়ীটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে। মাধু সিং এমনই পরিচিত লোক।

অতি সাধারণ ছোট ছোট তিন কামরার একটা বাড়ী মাধু সিং-এর। কামরাগুলো ছোট বটে, কিন্তু শক্ত করে গাঁথা। মাধু সিং বাড়ী আছে কিনা, সত্যি সে গাড়ী নিয়ে রোটাংডিতে ফিরে এসেছে কি না—তা ওর বাড়ীর কাউকে না জানিয়ে জেনে নিতে পারলে ভালো হয়।

মাধু সিং-এর বাবার নাম তিনু সিং, বুড়ো হয়ে পড়েছে। অবশ্য বয়সের তুলনায় চেহারাটা এখনো কিছু শক্ত, সমর্থ আছে। মাধু সিং-এর বউ হলো লছমী, দু'বছর আর চার বছর বয়সের দুটো ছেলে—এই নিয়ে তাদের সংসার। মাধু সিং মোটর মেকানিকের কাজ করে আর স্কুলের গাড়ী চালায়, এতে তার যা রোজগার হয়, তা দিয়ে মোটামুটি সচ্ছলভাবেই সংসার চলে যায়। বাড়ীর লাগোয়া কাঠাদেড়েক চৌকো ধরনের খালি অথচ ঘেরা জমি আছে, সেই ভূমিখণ্ডে তরিতরকারী লাগায় লছমী, বর্ষার পর থেকে চোতমাস পর্যন্ত বেশ ভালোই ফসল হয়, বাড়ীতে নিজেদের খাওয়া চলে, উদ্বৃত্ত ফসল হাটে বেসাতি করেও দু-চার টাকা থাকে। ছোট্ট সংসার—কোনোরকমে দিন কেটে যায়, দুঃখের ভাত সুখ করে খেতে জানে ওরা।

তিনু সিং ছোট বয়স থেকে সার্কাস পার্টিতে কাজ করতো, এটা-সেটা খেলা দেখাতো, দড়ির খেলা, তারের খেলা ; তারপর সাজতো ক্লাউন। ক্লাউন হিসেবেই ট্র্যাপিজের খেলায় তার খুব নামডাক হয়। কত মেডেল, কত ইনাম সে নিয়ে এসেছে—তার হিসেব নেই। সত্তরটা তালিমারা ক্লাউনের সাতরঙা জামা পরে, মেডেলের মালা গলায় দিয়ে, এক-একদিন বুড়ো তিনু সিং নাতি ছুটোকে চমকে দেয়, লছমীও মজা পায় খুব, এমনকি মাধু সিং-ও। তিনু সিং-এর মুখে সার্কাস জীবনের কথা ছাড়া আর অন্য কথা নেই। যে যে-কোন বিষয়েই আলাপ করুক না কেন, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তিনু সিং ঠিক সার্কাসের কথায় এনে ফেলবে। সার্কাস ছাড়া তার জীবনে বড় আর কিছু নেই।

তিনু সিং-এর এই চরিত্রটা সকলের জানা ছিল। তিনু সিং-এর বাড়ী গিয়েই প্রথমে আমরা মাধু সিং-এর খোঁজ করলুম। মাধুর বউ লছমী বললে—এখনো বাড়ী ফেরে নাই বাবু।

রোজ ফেরে কখন ?

ফেরে সন্ধ্যের পর। এক-একদিন স্কুলের গাড়ী রেখে কারখানায় কাজ করতে যায়, ফিরতে রাত হয়।

আজ কখন ফিরেছে ?

এমন সময় তিনু সিং-এর গলা পাওয়া গেল—কার সাথে বাত করছিস রে লছমী মা ?

আমরা এসেছি মাধু সিং-এর খোঁজে—রাতুলদা বললেন।

তিনু সিং এসে হাজির হলো। বুড়ো হয়েছে, কিন্তু চেহারায় তবু স্বাস্থ্যের একটা জৌলুস আছে। ছোট ছোট কাঁচাপাকা চুল মাথায়, দাড়ি-গোঁফ কামানো মুখ। কপালে কিছু কুঞ্চিত রেখা। এককালে চেহারা বেশ লম্বা চওড়া ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে বর্তমানে বার্ধক্যের ভাঙন শুরু হয়েছে। তিনু সিং এসেই আগে লছমীকে হুকুম দিলে—বাবুদের বসবার ব্যবস্থা করো আগে, চা তৈরী

করো, বিস্কুট ভি বোলাও, তারপর বাতচিত হবে।

লছমী ইতস্ততঃ করছে দেখে তিনু সিং ফের বললে—বাবুদের বসতে দাও আগে। ঘরের টুল এনে দাও, ওদিকে রোয়াকে কাঠের যে বাক্স আছে—সেটা লাও। মোড়া মাঙিয়ে আনো। না বসলে কি কোন কথা হয়—গরীবের বাড়ীতে যখন এসেছেন। যাও, যাও মা, জলদি করো।

আমাদের বসবার জন্যে অতো ব্যস্ত হবার দরকার নেই ; বিশেষ একটা কাজে আমরা এখানে তোমাদের কাছে এসেছি।

তা কি আর আমি বুঝিনি বাবু ? আমার কাছে, আমার বেটার কাছে কোনো মানুষ কখনো কাজ ছাড়া কি এসেছে ? কাজের কথা তো হবেই ; আগে বসুন, চা পান করুন, তবে কাজ হবে। আমাদের সার্কেস-জগতের এই হালচাল। আগে চা, পরে কাম। সার্কেসে যদি চা দেয় কেউ আপনাকে, আর আপনি যদি সেই চা না খান, তবে কোনো কাম আপনার সেখানে হবে না, কেউ কোনো কথাই শুনবে না আপনার। ভাববে—আপনি তাদের অপমান ভি করছেন !

এরই মধ্যে লছমী দু-তিনবারে একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স, দুটো ছোট ছোট টুল আর গোটা কয়েক মোড়া এনে দিলে, পরে বললে—চা বানিয়ে আনছি, বিস্কুট ভি আনছি।

কৃষ্ণমূর্তি জিজ্ঞাসা করলেন—মাধু সিং স্কুলের ছেলেদের নিয়ে এখনো পর্যন্ত কি করছে—বলুন তো ? সেই কোন্ সকালে ছেলেরা বেরিয়েছে স্কুলে—

তিনু সিং কৃষ্ণমূর্তির মুখের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললে—সার্কেসে একবার ম্যানেজার আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—তোমার মাকে গালি দেওয়া এখন বন্ধ করেছো ? আমি ফস করে বলে ফেলেছিলুম—হ্যাঁ। ব্যস্, ম্যানেজারের সে কি রাগ ! সেই থেকে প্রায় রোজই ম্যানেজার আমাকে তিরস্কার করতো, বলতো—তুমি

তো মাকে গালমন্দ করতে, এখন না হয় গালাগালিটা বন্ধ করেছো। আমি পরে ম্যানেজারের এই প্রশ্নের মজাটা বুঝতে পেরেছিলাম।

আমরা বিশেষ একটা জরুরী ব্যাপারে এখানে এসেছি,—আমাদের কিছু জিজ্ঞাসা আছে, খুব তাড়াতাড়ি তার জবাব দিতে হবে, কথা বাড়ালে চলবে না—রাতুলদা বললেন।

তিনু সিং একটু গম্ভীর হয়ে গেল, সে খুব নম্র কণ্ঠে বললে—জবাব তো দেবই বাবু, কিন্তু প্রশ্ন ভি সোজাসুজি করবেন।

আমি বললাম—মাধু সিং এখনো কেন বাচ্চাদের আটকে রেখেছে, আমরা সেই কথাই জানতে এসেছি।

তিনু সিং এবার সামান্য একটু হেসে জবাব দিলে—একই কথা তো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছেন বাবু। মাধু তো ছেলেদের পৌঁছে দিতে নিয়ে গেছে। তার বেশী আর আমরা কি করে জানবো, বাবুরা। মাধু যদি আটকে রাখে বাচ্চাদের—তবে মাধুই তা জানবে, আমরা জানবো কি করে? মাধু কি কখনো এমন কাজ করেছে বাবু? বাচ্চাদের সে বড় ভালবাসে, তাদের সে কখনো আটকাবে না, বাবু।

মাধু সিং রোটাংডি থেকে ঠিক সময়ে গাড়ী নিয়ে বের হয়, চারটে পনেরো মিনিটের সময় থানার দারোগাবাবুকে একটা চিঠি দিয়ে সে গাড়ী নিয়ে চলে যায় তিলুড়ির দিকে, কিন্তু তিলুড়িতে আর তাকে দেখা যায় নি। কোথায় যে সে গেল, আমরা কোনো খোঁজ পাচ্ছি না, তাই এখানে এসেছি তাঁর খোঁজ জানতে।

যাবে আবার কোথায় বাবু? তিলুড়ি হয়ে রূপজামেই গেছে মাধু। রূপজামের লেড়কাদের পৌঁছে দিতে যায় রোজ—নিস্পৃহ কণ্ঠে তিনু সিং বললে।

সে তো আমরা জানি, মাধু সিং-এর নিত্যকার কাজ তো তাই; কিন্তু আজ সে যায় নি, তাই আমরা এখানে তার খোঁজে এসেছি।

মাধু সিং এখন কোথায় আছে—তা এখনই জানার দরকার।

এ কথা শুনে তিন্নু সিং-ও যেন বেশ একটু চিন্তিত হলো বলে মনে হলো। মাধু সিং রূপজামে যায় নি—এর মানে কি হতে পারে?

মাধু তার কর্তব্য করে নি—এ কথা তিন্নু সিং বিশ্বাস করতে পারে না।

রোটাংডি থানা আর তিলুড়ির মধ্যে থেকে মাধু সিং-এর গাড়ী আর স্কুলের ছেলেরা—মানে যে ক'জন ছেলে ওই স্কুলবাসে ছিল—তাদের কোনো পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। মাধু সিং কি তোমায় কিছু বলে-টলে গেছে—রাতুলদা জিজ্ঞাসা করলেন।

না, তো—যেমন রোজ যায়, বেটা আজও তেমনি গেছে, কিছু বলে নাই।

লছমী মাটির ভাঁড়ে করে চা দিয়ে গেল, মাটির ভাঁড় হলে হবে কি, বেশ বড় বড় ভাঁড়, এ অঞ্চলে সর্বত্র এই ধরনের ভাঁড় খুব চলে দেখেছি। চায়ের সঙ্গে দিয়ে গেল কিছু বিস্কুট—কানাভাঙ্গা একটা প্লেটে করে।

তিন্নু সিং জিজ্ঞাসা করলে—লছমী রে, বেটা তোকে কিছু বলে গেছে নাকি, সাঁঝের বেলা কোথাও যাবার বাত আছে? মাধু তো ফেরে নাই আভিতক।

মাধু সিং যে হারিয়ে গেছে—আমাদের কথাবার্তা থেকে লছমী তেমন একটা কিছু আন্দাজ করে থাকবে। সে কিছু জানে না বলে ব্যাকুলভাবে চলে গেল।

তিন্নু সিং বললে—বেটা হারিয়ে গেল? জোয়ান মরদ এমনভাবে হারাবে কেন, বাবু?

রাতুলদা বললেন—হারাবে কেন—সেই তো আমাদের কথা। কোথায় আছে জানো? কোথায় যেতে পারে?

কৃষ্ণমূর্তি বললেন—বাচ্চারা সেই কোন্ সকালে অল্প কিছু খেয়ে বেরিয়েছে, টিফিনে কি একটুখানি খাবার খেয়েছে কি না খেয়েছে—

এখন এতো রাত হয়ে গেল, তাদের খাওয়া দাওয়া হয় নি। তাদের মায়েরা কাঁদছে,—হয়তো ছেলেরাও কাঁদছে; হয়তো কেন, নিশ্চয় তারাও এতক্ষণে কাঁদতে শুরু করেছে।

আমি বললুম—যদি জানো তো বলে ফেলো দয়া করে, ছেলেদের মা-বাবা বড় কষ্ট পাচ্ছেন।

তিনু সিং এবার বেশ দুর্ভাবিত হয়েছে বোঝা গেল। করুণ দৃষ্টি মেলে তিনু সিং একবার আমার দিকে তাকালো, পরে মাটির দিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে বললে—বাবুরা, আপনাদের ছেলে হারিয়েছে বলে আপনারা কষ্ট পাচ্ছেন, মাধু কি আমার বেটা নয়, আমি কি কষ্ট পাচ্ছি না এই বাত শুনে? মাধু তো কই রোজ কাজে বেইমানি করে না, ঠিক ঠিক কাজ করে আসে, বালবাচ্চাদের বড় পেয়ার করে, খুব ভালবাসে, ওদের কষ্ট দেখতে পারে না, সে কোথায় যাবে বাবু গাড়ী নিয়ে? হারিয়ে গেলে তো আমারও দুঃখ হবে বাবু—মাধু তো আমারও লেড়কা—

এ কথার পর আর কিছু বলা যায় না। হোক বড়, হোক বুড়ো, মাধু তো তিনু সিং-এরই ছেলে! মাধু সিং হারিয়ে গেলে কি বাবার প্রাণ কাঁদবে না? লছমী কি কাঁদবে না? লছমীর ছেলে দুটো কি কাঁদবে না? যদি মাধু সিং-এর কিছু হয়?

আমার মাধু গাড়ী চালায়, ধাক্কাধাক্কি লাগায় না, বাল বাচ্চাদের জ্যাদা ভালবাসে—কোথায় সে যাবে? তিনু সিং ভাবতে বসলো। একটু থেমে সে বলতে শুরু করলো—এ যে একেবারে সার্কেসে প্যাটের খেলার মতো দেখছি বাবু। জানেন আমাদের সার্কেসে প্যাট ছিল খুব বড় খেলোয়াড়। খেলোয়াড় না বলে বরং তাকে ম্যাজিসিয়ান বলতে পারেন। মোটর বাইসিকেল সমেত একটা মেয়েকে সে রোজ খেলার ঠিক শেষ সময়ে অদৃশ্য করে দিত, আর বলতো—মেয়েটাকে অদৃশ্য করে দিলাম এই এরিনা থেকে, বাইরে টিকিট ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সে আপনাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছে—আপনাদের আত্মীয়

বন্ধুদের জন্যে টিকিট কিনতে গেলেই তাকে দেখতে পাবেন। এই প্যাটের খেলা যা জমতো—

তিনু সিং-এর কথা শেষ হবার আগেই একটা সাইরেনের মতো তীক্ষ্ণ আওয়াজ শোনা গেল। আওয়াজটা দূর থেকে ভেসে এল। একটু পরেই বোঝা গেল—এটা অন্য কিছু নয়, পুলিশের গাড়ীর হর্ণ। বুঝলুম দারোগাবাবু এবার গোয়েন্দা দল নিয়ে এদিকে আসছেন—মাধু সিং-এর বাড়ীতে হয়তো কিছু খোঁজ খবর নেবেন।

তিনু সিং ততক্ষণে সেই প্যাটের আর একটা খেলার বর্ণনা শুরু করে দিয়েছে—এই যে ভ্যানিশ হয়ে যাওয়া বলছেন—কত রকমে যে ভ্যানিশ করা যায় জানেন? একটা টেবিল টেনে আনা হলো এরিনার মাঝখানে, টেবিলের চারদিক গাঢ় গোলাপী রঙের কাপড়ের পর্দা দিয়ে ঢাকা, দূর থেকে দেখলে মনে হয় ঘাঘরা পরানো যেন। প্যাট এল তারপরে। প্যাট ছিল বেঁটে, কোলকাতার ওয়েলেস্‌লি পাড়ার লোক, য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান সে, সম্পূর্ণ নাম জানি না, তবে প্যাট্রিক দি ম্যাজিসিয়ান বললে হয়তো আপনারাও চিনতে পারবেন। সংক্ষেপে আমরা সবাই তাকে প্যাট বলতাম। সার্কেসের জগতে প্যাটের মতো মজার লোক খুব কম ছিল। ছোট একটা ব্যাটন নিয়ে সেই বেঁটে মানুষ প্যাট মেডেলের মালা গলায় ঝুলিয়ে এসে বলতো—আপনারা বলুন—কার কোন্ জিনিসটা আমি ভ্যানিশ করে দেব। লোককেও ভ্যানিশ করে দিতে পারি। দেব আপনাদের মধ্যে থেকে কোনো লোককে ভ্যানিশ করে? উঠে আসুন আমার কাছে। কেউ অবশ্য উঠে আসতো না—দর্শকের মধ্যে থেকে। সেই দৃশ্যে এসে ঢুকতাম আমি আর আমার এক পার্টনার—খুব বেঁটে বামন একটা ক্লাউন। আমি এসে প্যাটকে বলতাম—ভ্যানিশ করে দাও আমার এই স্যাঙাতকে। প্যাটের জবাব—ঠিক আছে, ভ্যানিশ করার এই টেবিলের ওপর বসুক সে। বেঁটে

ক্লাউনকে গোলাপী পর্দা ঢাকা টেবিলের ওপর বসানো হলো, প্যাট তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা কালো চাদরে ঢেকে দিতেই সত্যি সত্যি সে উবে গেল! সব দর্শক একেবারে থ' বনে গেল। শুধু যে মানুষকে লোপাট করে দিত প্যাট, তা নয়—যে কোন জিনিসকেই সে হাবিস করে দিতে পারতো। প্যাট এই খেলাটা খুব জাঁকের সঙ্গে দেখাতো। ঐ টেবিলের ওপর বেশ মোটা মোটা কয়েকটা বই রাখলো—বিড় বিড় করে দুটো মন্ত্র আওড়াতে না আওড়াতেই সেই বইগুলো অদৃশ্য হলো। শুধু বই নয়—এইভাবে হাঁস, মুর্গী, ঘটি, বাটি, লাঠি,—যা কিছুই রাখা যায় চাদর মুড়ে—তাই লোপাট হয়ে যায়। প্যাটের খেলায় সবাই হাঁ হয়ে গেল। দর্শকেরা সবচেয়ে অবাক হয়ে যেত কখন? যখন টেবিলের তলা থেকে সেই ক্লাউনটি হাঁস, মুর্গী, ঘটি, বাটি, লাঠি, ছাতা,—সব হারানো জিনিস নিয়ে বেরিয়ে এল। কি করে এটা সম্ভব হতো? আসলে টেবিলের মাঝখানটা ছিল কাটা। তাই বলি বাবু, কোনো জিনিসই হারায় না; হারানোর খেলা চলে মাত্র।

আমাদের মনের যা অবস্থা, সার্কাসের এই গল্প শুনতে ভালো লাগছিল না, কিন্তু তিনু সিং-কে বলেও বোঝাতে পারবো না—আমাদের মনের উদ্বেগ, বলতে গেলেই সে বলছে---মাধু তো আমার লেড়কা বাবু, আমার দিলেও দরদ কম নয়।

অন্যসময় হলে তিনু সিং-কে বলতুম—তুমি যে সার্কাসের কথা বলতে বার বার সার্কেস বলছো, কথাটা তো সার্কেস নয়, সার্কাস।

কিন্তু এখন মনের মধ্যে তীব্র ব্যাকুলতা, রাতুলদার ছেলেটার জন্যে আমারও মনটা হু হু করছিল, কি রকম যেন কষ্ট হচ্ছে। রাতুলদা আর কৃষ্ণমুর্তিও তিনু সিং-এর লম্বা বক্তৃতা পছন্দ করছিলেন না, তা তাদের হাবভাবে বোঝা যাচ্ছিল। তবে তিনু সিং-এর শেষ কথাটায় একটা দার্শনিকতার ছোঁয়া থাকায় শুনতে একটু ভালো লেগে থাকবে। কোনো জিনিসই হারায় না, হারানোর খেলা চলে মাত্র।

ইতিমধ্যে দারোগাবাবু আর তাঁর সঙ্গে জন চারেক গোয়েন্দা

পুলিশ এসে গেছেন। গোয়েন্দাদের মধ্যে ত্রিলোচনবাবু আছেন, উনি এ অঞ্চলে বেশ নাম করা গোয়েন্দা। এঁরা এসে তিনু সিং-এর গল্পের একেবারে শেষের কথাটি শুনলেন। দারোগাবাবু তিনু সিং-এর কথার খেই ধরেই জিজ্ঞাসা করলেন—কিছু হারায় না বলছো,—স্কুলের গাড়ী শুদ্ধ তোমার ছেলেও তাহলে হারায়নি বলছো?

তিনু সিং জবাব দিলে—তেমন কথা বলতে পারি কই হুজুর; আমি বলছি সার্কেসের কথা, সার্কেসে কিছু হারায় না।

ত্রিলোচনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—সার্কাসের বাইরে আর সব বুঝি হারায়?

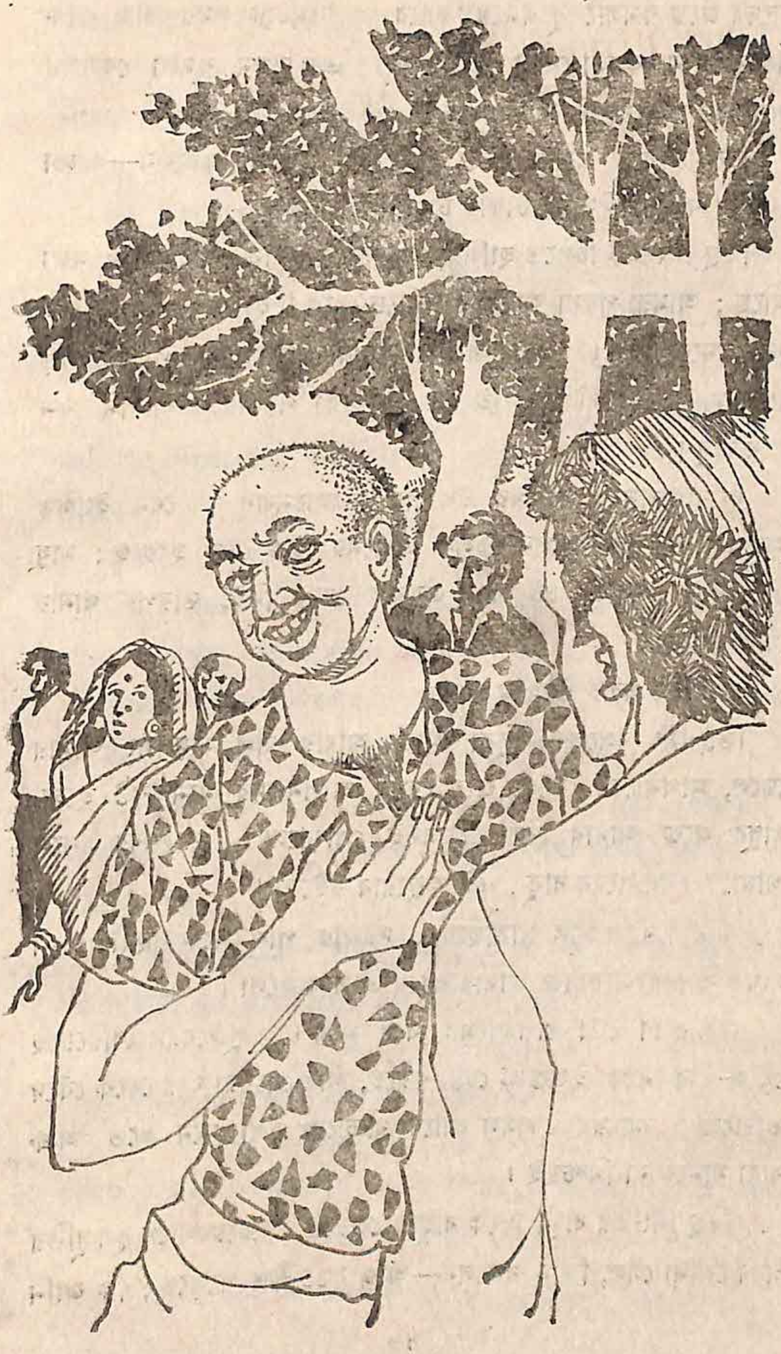
তা দেখুন বাবু, যদি বাইরেটা আপনারা সার্কেস ভাবেন তবে এখানকার হারানোটাও খেলা বৈকি! আমাদের সার্কেসের নারাণবাবু বলতেন—জগৎটাই তো সার্কেসের একটা মস্ত জায়গা, পৃথিবীটা হলো এক বিচিত্র এরেনা। আমরা সবাই এখানে সার্কেস দেখিয়েই চলেছি।

ত্রিলোচনবাবু তিনু সিং-কে ধমক দিয়ে বললেন—থামো, তোমার দার্শনিকতার কোনো দরকার নেই। মাধু সিং আজ বাড়ী থেকে বের হবার সময় কি বলে গেছে তোমাদের।

ধমকে তিনু সিং ভয় পাবার লোক নয়, সে বেশ দৃঢ়তা নিয়েই বললে—কি আবার বলবে? রোজ যেমন যায়—তার বাচ্চা তুটোকে আদর করে, তেমনি আজো ছেলে তুটোকে আদর জানিয়ে চলে গেল। অন্যদিন আর আজকের মধ্যে কোনো তফাৎ ঘটে নি।

ত্রিলোচনবাবু মাধু সিং-এর স্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন। লছমী এলে তাকেও ওই একই প্রশ্ন করা হলো—যাবার সময় মাধু সিং কি কি বলে গেছে, অন্যদিনের চেয়ে আজ কোনো রকম তফাৎ কিছু ঘটেছে নাকি?

লছমী প্রায় কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বললে—আজ সকালে বাচ্চা তুটো কমলালেবু খাবার জন্যে কান্না ধরেছিল, ওর বাবা তুপুরের খাওয়া সেরে বের হবার সময় খোকা তুটোকে আদর জানিয়ে বলে গেল



তিনু সিং বলল—যদি বাইরেটা আপনারা সার্কেস ভাবেন, তবে এই হারানোটাও খেলা বৈকি!

তাদের জন্যে কমলালেবু নিয়ে ফিরবে। তিনটার সময় রোজ নাকি বাজার পানে কমলা ফেরী করে যায়। এক ডজন কমলা কেনবার জন্যে চার রুপেয়া ভি নিয়ে গেছে।

ত্রিলোচনবাবু এবার তিনু সিং-কে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা ইদানীং কি মাধু সিং-এর টাকার টানাটানি যাচ্ছে ?

তিনু সিং এক চিলতে হাসির সঙ্গে বললে—বাবু এ আমাদের মজা আছে ; আমরা পয়সা আওরতের কাছে রেখে দিই ; যখন যা দরকার হয়, মেঙে নিই। আমি বরাবর মাধুর মার কাছে পয়সা কড়ি রাখতাম, আমার বেটাও তাই করে। টাকা পয়সার টানাটানি কেন যাবে বাবু !

দারোগাবাবুকে চোখের ইশারায় ত্রিলোচনবাবু কি যেন ইংগিত করলেন, তারপর বললেন—চলুন এখানের কাজ শেষ হয়েছে ; মাধু সিং-এর কারখানাটা চট করে একবার দেখে নিই, তারপর থানায় ফেরা যাবে।

আমরাও সবাই উঠলাম।

তিনু সিং বললে—বাবুরা আমি আবার বলি মাধু সিং আমার ছেলে, আপনাদের ছেলের জন্যে যেমন আপনাদের মনে কষ্ট হচ্ছে, মাধুর জন্যে আমার দিলও তেমনই পোড়াচ্ছে। ওর খবর পেলে আমাকেও জানাবেন বাবু, এই অনুরোধ রইলো।

আমরা যখন চলে আসছিলাম, দরজার পাশ থেকে লছমীর চাপা সংযত কান্নার আওয়াজ আমার কানে এসে বাজলো।

এই কান্না তো রূপজামের ঘরে ঘরে। পুরুষেরা বেরিয়েছে খোঁজ-খবর নিতে, ইতস্ততঃ চেষ্টা করছে, আর মেয়েরা ঘরে থেকে কেঁদে ভাসাচ্ছে। মায়ের কোমল প্রাণে বাচ্চাদের কথা মনে হতে অশ্রু বাধা মানছে না নিশ্চয়ই।

তিনু সিং-এর বাড়ী থেকে বাইরে বেরিয়ে সবচেয়ে আগে কৃষ্ণমূর্তির গলা শোনা গেল, তিনি বললেন—আজ বড্ড শীত পড়েছে ; কি জানি

বাচ্চারা যে কোথায় আছে! এই কথা বলে তিনি একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। দেখলাম রাতুলদার চোখ ছুটো ছল ছল করছে। আমার মতো নিষ্ঠুর মানুষের বুকের ভেতরটাও কষ্টে বেদনায় গুর্ গুর্ করতে লাগলো।

দারোগাবাবু ত্রিলোচনবাবু প্রভৃতি গোয়েন্দাদের নিয়ে মাধু সিং-এর কারখানার দিকে চলে গেলেন। রাতুলদা রোটাংডির এক ডাক্তারখানা থেকে রূপজামে বাড়ীতে টেলিফোন করে জানলেন—না, এখনো সেখানে কোনো খবর পৌঁছয় নি, রূপজামের সবাই তাদের কাছে খোঁজ-খবর পাবে—এই প্রত্যাশায় পথের দিকে চেয়ে বসে আছে। কচিকাচা কিশোরদের জন্যে তাদের মায়েরা বাড়ীর সদরে বসে বসে কাঁদছেন।

বাচ্চারা ফেরেনি!

এই সংবাদটা যে এখন কত মর্মান্তিক—তা কি করে বোঝানো যাবে? ভাষায় সেই মনোভাব ব্যক্ত করা যায় না।

কৃষ্ণমূর্তি বললেন—চলুন, আমরাও থানায় গিয়ে জানি, পুলিশ এই ব্যাপারটা সম্পর্কে শেষমেশ কি সিদ্ধান্ত করেছেন।

আমি বললাম—ত্রিলোচনবাবু তো তিন্নু সিংকে ছুটো একটা প্রশ্ন করেই উঠে এলেন, ব্যাপারটায় তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন বলে মনে হয় না।

কৃষ্ণমূর্তি বললেন—আমার মনে হলো তিন্নু সিং কিছু জানে, নইলে হারানোর কথায় অমন হেসে উঠবে কেন?

রাতুলদা বললেন—তিন্নু সিং স্পষ্ট তো বলেই দিলে যে জগতে কিছুই হারায় না, হারানো-হারানো খেলা চলে মাত্র।

আমি বললাম—এটা এমনি কথার কথা; সার্কাসের ক্লাউন ছিল, বকবক করার অভ্যাসটা এখনো আছে, সার্কাসের গল্প করতে ভালবাসে। প্যাটের হারানোর খেলা দেখানো আর মাধু সিং-এর গাড়ী হারানো কখনোই এক নয়।

কৃষ্ণমূর্তি তবু একবার বললেন—ফাঁপা ঘেরাটোপ ঢাকা টেবিলের গল্পটা শোনালো কেন আমাদের ; মাধু সিং ওর ছেলে ; ছেলে হারিয়েছে শুনে তো ওর দুঃখ হবে ?

আমি বললাম—দুঃখ খুবই হয়েছে, তবে কোনো দুঃখই বুড়োকে সার্কাসের গল্প বলা থেকে থামাতে পারে না, আর সার্কাসের কথাতেই বুড়ো পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে—তাই বাইরে থেকে ওর দুঃখটা চট করে বোঝা যায় না।

কৃষ্ণমূর্তিও রোটাংডির এক চেনা কোয়ার্টারে ঢুকে লুন্টিতে নিজের বাড়ীতে একটা ফোন করে জানলেন—বাড়ীতে বাচ্চা এখনো ফেরেনি, বাড়ীতে যথারীতি কান্নাকাটি চলছে।

রোটাংডি-লুন্টি-তিলুড়ি-রূপজাম—সর্বত্র বিষণ্ণতার একটা কালো চাদর চাপা পড়েছে যেন—মর্মন্তুদ কি করুণ চাপা-কান্নার একটা অশ্রুত আওয়াজে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। সহজভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারা যায় না, বেদনা বুকে চেপে বসে! আমারই যদি এই অবস্থা তাহলে বাচ্চাগুলোর মা-বাবা কেমন করে প্রাণে বেঁচে আছে ? রাতুলদার, কৃষ্ণমূর্তির না-জানি কি কষ্ট হচ্ছে!

তিনু সিং-এর কাছ থেকে আমরা তার ছেলে মাধু সিং-এর কোন খোঁজ খবর পেলাম না বটে, তবে তার সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা ছিল, অর্থাৎ সে যে সৎলোক—তার আর কোনো বদল হলো না। মাধু সিং-এর বাড়ীর চেহারা দেখে, তার বাবার সঙ্গে কথা বলে, তার বউকে দেখে—মাধু সিং যে সাধু প্রকৃতির মানুষ, কোনো দুষ্ট বুদ্ধি তার মাথায় নেই—তা বুঝতে আমাদের অসুবিধে হলো না। যদি জানা যেত যে সে বদ্ প্রকৃতির লোক, তা হলেও বা একটা কথা ছিল।

আমরা থানায় আসার আগেই দারোগা সাহেব তাঁর দলবল নিয়ে সেখানে পৌঁছেছেন। আমরা সেখানে গিয়ে বুঝতে পারলুম যে এখন

এই স্কুল-বাসটার লোপাট হয়ে যাওয়ার ব্যাপারই প্রাধান্য পেয়েছে। সকলেই এই নিয়ে ভাবছে, মাধু সিং বাচ্চাদের নিয়ে কোথায় যেতে পারে?—স্কুল-বাসটা হাইজ্যাক করে টানতে টানতে কোথাও নিয়ে যাবে কেউ—একটা বাস একেবারে লোপাট হয়ে যাবে—এই জাতীয় কথাই শুনলুম পুলিশ থেকে য়্যাসিস্ট্যাণ্ট ইন্সপেক্টরের মুখে। এসব প্রশ্ন সর্বদাই আমাদের মনে উঁকি দিচ্ছে।

কৃষ্ণমূর্তি থানায় পৌঁছেই য়্যাসিস্ট্যাণ্ট ইন্সপেক্টরকে জিজ্ঞাসা করলেন—ছোটবাবু, ব্যাপারটার কোনো হদিস হলো? আমরা যে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

ছোটবাবু কিছু বলার আগেই ত্রিলোচনবাবু বললেন—এটা এমন একটা ঘটনা যা চট করে ব্যাখ্যা করবার নয়। আপনার মতো আমিও টর্চ জ্বেলে তিলুড়ি হ্রদের ধারের রেলিং, লাইটপোস্ট, কংক্রীটের দেওয়াল পরীক্ষা করে দেখেছি, ঘুরে অন্য কোনোদিক দিয়ে যদি গাড়ীটা তিলুড়ির জলে গিয়ে পড়ে—তবে তা স্বতন্ত্র কথা, আমি তো মনে করি সে সম্ভাবনা কম, কেন না পথের পাশে যেখানে জল, সেখানে বেড়া রয়েছে। জল যেখানে এক ফার্লং দূরে, সেখানকার পথে অবশ্য বেড়া নেই, কিন্তু গাছপালা রয়েছে; পাথুরে পথ—গাড়ী আদৌ চলতে পারে না, যদি চলেও, তবু স্পীড কমে যাবে। তবে এখানকার ছোটবাবুর মত হচ্ছে তিলুড়ি হ্রদটা খোঁজা—ওর গর্ভেই বাসটা গিয়ে পড়েছে।—আর এছাড়া, আপাততঃ অন্য কিছু ভাবাও যাচ্ছে না। আমি যতদূর খোঁজ নিয়েছি—ড্রাইভার মাধু সিং নেশা-টেশা করে না; সুতরাং বেপথে তার গাড়ী যাবে না; সে তো কখনো বেহেড হয় না।

দারোগাবাবু বললেন—তিলুড়ির জলে যদি না পড়ে তবে গাড়ীটা উবে যাবার আর কোনো ব্যাখ্যাও তো দেওয়া যায় না।

ত্রিলোচনবাবু বললেন—আমি যখন প্রথম ফোন করেছিলাম—তখন কথায় কথায় একটু ইঙ্গিত দিয়েছিলাম—কোনো বদ মতলব এর

পেছনে আছে কিনা আমাদের ভাবতে হবে। আমি প্রথমটা সে রকম ভেবেই এগোচ্ছিলাম; কিন্তু মাধু সিং সম্পর্কে যতটা জানলাম—তাতে তার প্রতি সন্দেহ করা চলে না। রোটাংডির সকলেরই সে প্রিয়, সকলে তাকে ভালবাসে, সেও সকলকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। সুতরাং তার দ্বারা কি করে এমন একটা দুষ্কার্য করা সম্ভব হবে? দারোগাবাবু নিজে তো মাধু সিং-এর হয়ে সারাপথ আমার কাছে ওকালতি করেছেন। একটু আগে রোটাংডি মোড়ের এক ফলওয়ালাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আসছি। তার নাম বংশী; ক'দিন থেকে সে কমলালেবু বেচছিল। আজ মাধু সিং যখন তার কাছে কমলা লেবু কিনতে যায়—তখন সে খুব বেশী দর হাঁকে। মাধু বংশীর ওপর চটে যায়, বংশীও খুব চোটপাট করে, এমনকি বংশী বলে যে সে আজ মাধুকে দেখে নেবে। মাধু তাতে বলে যে কি দেখে নেবে সে, রূপজামে ছেলেদের পৌঁছে দিয়ে আসুক আগে, তারপর বংশীর সঙ্গে বোঝাপড়া হবে।

এ পর্যন্ত বলে ত্রিলোচনবাবু একটু থামলেন, আমাদের সকলের দিকে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টি মেলে ধরলেন, তারপর আবার বলতে শুরু করলেন—বংশী মাধুকে কি জবাব দিয়েছিল—তা বংশী বলতে পারলো না, সে শুধু বললে—মাধুটা বড় চালাক লোক আছে, কখনো তাকে ঠকিয়ে দুটো পয়সা বেশী লাভ করা যায় না। ওর কথায় আমরা কখনো রাগ করি না, ওকে আমাদের সকলের কাজে লাগে, যখন যে কাজ বলি, মাধু না বলে না। এই কথা শুনে আমি বংশীকে খানিক বাদে—তার দোকান বন্ধ করার পর আমার সঙ্গে এখানে দেখা করতে বলে এসেছি।

ত্রিলোচনবাবুর কথা বলার ধরন দেখে মনে হলো যেন তিনি কিছু চেপে যাচ্ছেন। তিনি আমাদের কাছে সবকিছু প্রকাশ করতে চান না। গোয়েন্দাদের পক্ষে সবসময় সবার কাছে সবকিছু প্রকাশ করা উচিতও নয়, তাই আমাদের পক্ষ থেকে কোনোরকম পীড়াপীড়ি করাও ঠিক নয়। তবু রাতুলদা খুব নরম সুরে তাঁকে জিজ্ঞাসা

করলেন—কোনোরকম সিদ্ধান্তে কি আপনারা পৌঁছেছেন—না, সবটাই এখনো ধারণার পর্যায়ে রয়েছে ?

ত্রিলোচনবাবু বললেন—মাধু সিং-এর বউয়ের মুখে কমলালেবু কেনার কথা শুনে আমি নিজে ওই বংশীর খোঁজ করলুম, যদি কিছু সূত্র পাই, কিন্তু নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারা যায়—এমন কোনো-কিছুই এখনো পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারা যায় নি। একটা গোটা গাড়ী লোপাট হয়ে গেল একমাত্র পিচের রাস্তা থেকে, কোনো গলি ঘুঁজি নেই, ঘোরানো পথ নয়—তাছাড়া বিকেলবেলা, দিনের আলো তখনো ছিল—এর কি ব্যাখ্যা দেব বলুন। আমরাও বেশ ভাবিত রয়েছি।

কৃষ্ণমূর্তি বললেন—বাচ্চাগুলোর কথাটা একবার ভাবুন, সেই সাত সকালে বেরিয়েছে বাড়ী থেকে।

ত্রিলোচনবাবু বললেন—আপনি তো সেই থেকেই ছেলেদের কথা বলছেন, আমরা কিন্তু ব্যাপারটা সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখছি, বাচ্চাদের কি হচ্ছে, কিম্বা মাধু সিং-এর মনে এখন কেমন অনুভূতি জাগছে—এভাবে টুকরো টুকরো করে আমরা বিষয়টা দেখছি না। গোটা একটা কাণ্ডই এর জন্যে দায়ী, আর সেই কাণ্ডটা যে কি—তা নিয়েই কিন্তু আমাদের যত ভাবনা।

রাতুলদা বেশ আর্তস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—কোনো বড় রকমের ছেলেধরার দলটল নেই তো এর পেছনে ?

তা যে নেই, এমন কথা হলপ করে কি করে বলি ? আজকাল বাচ্চাদের ধরার জন্যে আন্তর্জাতিক দল গোপনে গোপনে কাজ করছে, আগে এই অঞ্চল থেকে এক আধটা ছেলে চুরি যেতো, বদমায়েসের দল তাকে কাণা, খোঁড়া বা অন্ধ করে ভিন রাজ্যে পথের ধারে বসিয়ে রাখতো, ভিক্ষে করাতো। কিন্তু এখন বিশ্বব্যাপী ছেলেধরার দল একযোগে কাজ করে, এ-দেশ থেকে ও-দেশে, ও-দেশ থেকে বিদেশে—ছেলেদের পাচার করা হচ্ছে !

একথা শুনে কৃষ্ণমূর্তি সজোরে কেঁদে উঠলেন,—তাহলে এখন উপায় ?

মাধু সিং-এর গাড়ীশুদ্ধ ছেলেগুলি যে চুরি হয়ে গেছে এমন কথা বলছি না ; আজ বিকেলে এখন থেকে মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে ঘটনা ঘটেছে—এর মধ্যে এত ব্যাকুল হবার কারণ হয় নি। আমরা চেষ্টা করছি কোনো একটা সূত্র পেলেই রহস্যের সমাধান ঘটবে। এজন্যে এত বেশী বিচলিত হবেন না। অভিভাবকদের পক্ষে ব্যাকুল বা বিচলিত হওয়া একটুও অস্বাভাবিক নয়। গোটা পরিবেশটাই যেমন করুণ আর তেমনই অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। ত্রিলোচনবাবু তাঁর বক্তব্য থামিয়ে দারোদাবাবুর দিকে তাকালেন।

দারোগাবাবু তখন আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—রোটাংডি, রূপজাম, ভুজুডি, শোংখারো—সবদিকেই খবর গেছে, সতর্ক পুলিশ পাহারা বসেছে, গাড়ীটাকে খোঁজার কাজ আরম্ভ হয়েছে।

কৃষ্ণমূর্তি অস্ফুট বেদনার্ত কণ্ঠে বললেন—আমরা এখন কি করবো ? বাড়ী ফিরে যাবো কি করে ?

নিস্পৃহ কণ্ঠে দারোদাবাবু বললেন—এই মুহূর্তে আমাদের করবার আর কিছু নেই ; যদি গাড়ীটা তিলুড়ির জলে ডুবে গিয়ে থাকে তবে তো হয়েই গেল, আমাদের সকলের মন্দভাগ্য বলে তা মেনে নিতেই হবে। নচেৎ কাল সকালে আবার যা হয় করা যাবে। এখন তো আপনাদের আবার রূপজামে ফিরতে হবে।

অর্থাৎ তিনি আমাদের উঠতে বললেন ঘুরিয়ে। আমরা উঠে দাঁড়াতে ত্রিলোচনবাবুকে দেখিয়ে দারোগা সাহেব বললেন—স্যার যখন এসে পড়েছেন, তখন একটা কিছু বিহিত হবেই, আমরা চেষ্টার ত্রুটি করছি না, আর আপনাদেরই বা কি বলে সান্ত্বনা দেব, তবু অবস্থাকে তো মেনে নিতেই হবে।

আমতা আমতা করে আমি বললাম—এই যে বললেন—তিলুড়ি

হ্রদেই গাড়ীটা ডুবে যেতে পারে—তাহলে তো সমস্যার সমাধান হয়েই গেল।

কৃষ্ণমূর্তি তখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন, রাতুলদার চোখের কোণের জল চিকচিক করছিল। আমিও যেন কেমন হয়ে গেছি।

ত্রিলোচনবাবু বললেন—মাধু সিং আপনাদের যত প্রিয়ই হোক, আমি তবু বলছি—ওর মনে কোনো দুরভিসন্ধি থাকলেও থাকতে পারে। কোনো গুণ্ডাদলের সঙ্গে যোগসাজসে বাচ্চাদের কোনো ক্ষতি করবে না, এমন কথা কি জোর করে বলা যায়?

ত্রিলোচনবাবুর এই প্রশ্নে আমাদের মনে নতুন করে আবার চঞ্চলতা এল, কি এমন দুরভিসন্ধি থাকতে পারে মাধু সিং-এর মনে? গুণ্ডাদের হাতে মাধু সিং বাচ্চাদের তুলে দেবে? অথচ এত ভালো সে—

কৃষ্ণমূর্তি প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—বাচ্চাদের মেরে ফেলতে চায় নাকি সে?

না—ত্রিলোচনবাবু সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন—না, না, ঠিক তার উল্টো। বাচ্চাদের সযত্নে সে বাঁচিয়েই রাখবে, যত্নের পরিমাণ বরং কিছু বেশীই হবে; বাচ্ছাদের মেরে ফেললে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।

আপনার কথা আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না—রাতুলদা বললেন।

ত্রিলোচনবাবু পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে বললেন—ছেলেদের আটকে রেখে মাধু সিং কিছু টাকা আদায়ের ফন্দী আঁটতে পারে; কাল সকালেই আপনারা বেনামা চিঠি পেতে পারেন—টাকার বিনিময়ে আপনাদের ছেলে ফিরে পাবার প্রতিশ্রুতিপূর্ণ কোনো চিঠি পান কিনা—তা দেখুন।

অবশেষে মাধু সিং?—কৃষ্ণমূর্তি কথাটা শেষ করতেও পারলেন না।

ত্রিলোচনবাবু বললেন—না, আমি একেবারে নির্দিষ্ট করে এখনো বলতে পারি না যে মাধু সিং ছেলেদের কিডন্যাপ করেছে, আটক

রেখে টাকা আদায়ের ফন্দী আঁটছে। মাধু সিং নিজে চিঠি দেবে না—একটা দল ওর থাকতে পারে, দলের কেউ হয়তো টাকার জন্যে আসতে পারে—যাইহোক, সে কাল সকালে দেখা যাবে'খন।

ত্রিলোচনবাবুর কথার খেই ধরেই দারোগাবাবু বললেন—এমনও হতে পারে, হয়তো মাধু সিং শুদ্ধুই অন্য কোনো দলের হাতে বন্দী হয়েছে, ওরা—

আমি বললাম—কিন্তু কথা হচ্ছে, গাড়ীশুদ্ধু ছেলেরা আর ড্রাইভার গেল কোথায়? বন্দী করে যদি ছেলেদের লুকিয়ে রাখা হয় জঙ্গলে—গাড়ীটা তবে গেল কোথায়?

দারোগাবাবু বললেন—কাল সকালে খোঁজা যাবে—কোথায় গেল গাড়ীটা। তিলুড়ির জলেও খোঁজ করা হবে; মাইথনের জল-পুলিশকে খবর করেছি, ওখানে এখন ভারতসরকারের নেভির অনুসন্ধানকারী দল এসেছে, কয়েকদিন আগে মাইথনে একটা স্পীড বোট ডুবি হয়েছে, সেইটে খুঁজে দেবার জন্যে এসেছিল, খুঁজে সেটা তুলে দিয়েছে, কাল সকালেই এখানে এসে একবার তিলুড়ির জলে নামবে। স্কুলবাসটা যদি জলে ডুবেই যায়, তবে গাড়ীটা বা মৃতদেহ পাওয়া যাবে। আজ রাতে আর কিছু করবার নেই, আবার ভোর থেকেই কাজ শুরু হবে। দেখুন রাতের মধ্যে কোনো চিঠি পত্তর পান কিনা।

চিঠিপত্রের কথায় দেখলাম মিঃ বিশ্বাস একটু উৎফুল্ল বোধ করলেন। বলতে ভুলে গেছি—ইতিমধ্যে তিনি থানায় এসে পুলিশ গাড়ী-লোপাটের ব্যাপারটা কেমনভাবে নিচ্ছে—তা জানতে এসে-ছিলেন। ছেলেদের কিডন্যাপ করে নিয়ে যাবার সম্ভাবনার কথা শুনে তিনি বললেন—মনে হচ্ছে আমিই বোধহয় সবচেয়ে আগে চিঠি পাবো, পাবো বলছি কেন, বাড়ী গিয়ে হয়তো দেখবো—কে বা কারা এসে আমাকে চিঠি দিয়ে গেছে।

ত্রিলোচনবাবু বাঁকা চোখে একবার মিঃ বিশ্বাসের দিকে তাকিয়ে

জিজ্ঞাসা করলেন—হঠাৎ এই কথা আপনার মনে হচ্ছে কেন ?

মনে হবে না ? আমার সঙ্গে যে হাজার লোকের শত্রুতা রয়েছে, তাদের অনেকেই গুণ্ডাশ্রেণীর, অনেকেই আমাকে রাতদিন ভয় দেখায়, জব্দ করবে বলে শাসায়। আমার ছেলেকে আটক করে টাকা আদায়ের ফন্দী যে না করতে পারে—এমন নয়। আপনি যখন স্কুল বাসটা লোপাট হবার সম্ভাব্য কারণের কথা বলছিলেন—তখনই আমি ভাবলুম যে আমিই উপলক্ষ। আমার ছেলেকেই তুলে নিয়ে যাবার জন্যে স্কুল বাসটা আটক করেছে।

দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করছিলেন—কারা আপনার ছেলেকে তুলে নিয়ে যেতে পারে বলে সন্দেহ করছেন ?

আমার সন্দেহ কি একটা লোকের ওপর হচ্ছে ? শত্রু কি আমার একজন, না একটিমাত্র দল ? কাকে ছেড়ে কার কথা বলবো ?

ত্রিলোচনবাবু মিঃ বিশ্বাসের চেহারাটা আপাদমস্তক লক্ষ্য করে নিলেন ; পরে একটু কড়া সুরে বললেন—সংক্ষেপে নাম করে যান—যাদের সম্পর্কে আপনার সন্দেহ জাগছে। আমরা একটা লিস্ট করে নিচ্ছি।

দারোগাবাবু বললেন—এর দ্বারা মনে হচ্ছে—আপনি তো সাধারণ লোক নন, যার শত্রুসংখ্যা এত—তিনি তো যে সে লোক নন !

দারোগাবাবুর এই কথায় মিঃ বিশ্বাস বেশ গর্ববোধ করলেন বলে মনে হলো। এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে তিনি বলতে শুরু করলেন—তা আপনাদের আশীর্বাদে হাজার হাজার শত্রু নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়।

দারোগাবাবু একটু বাধা দিয়ে বললেন—তাহলে মিত্র বলতে আপনার কেউ নেই—মনে হচ্ছে !

ভালোলোকের আর বিখ্যাত লোকের মিত্র বলতে ক'জন থাকে বলুন ? সবাই তো তাকে ঈর্ষা করে। আমারও হয়েছে তাই !

ত্রিলোচনবাবু বাধা দিলেন—তা বুঝতে পারছি, এদিক থেকে

আপনি সত্যিই দুর্ভাগা। কিন্তু আপনার শত্রুদের নামের তালিকা দিন, আমি কাগজ আর ডটপেন নিয়ে বসে আছি।

ও, হ্যাঁ। লিখুন—প্রথমে আপনি দাপন লোধার নাম লিখুন।

কে এই দাপন লোধা, তার একটু পরিচয় দিন।

মিঃ বিশ্বাস একবার আমাদের দিকে আর একবার দারোগা সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন—এই দাপন লোধা আগে ছিল শ্রমিক সর্দার। কন্ট্রাক্টরদের শ্রমিক সরবরাহ করতো, তাতে মোটা কমিশন থাকতো তার, তার ওপর শ্রমিকদের কাছ থেকেও টাকা পিটতো, টাকা ঘুষ না দিলে সে কোনো শ্রমিককেই কাজে লাগাবার জন্যে নাম দিতো না। আমি লেবার কন্ট্রাক্টরি করতাম, আমার কাছ থেকে নির্দিষ্ট হারে টাকা সে পেতো, কিন্তু একবার হঠাৎ বেশী টাকা দাবী করে বসলো। আমি টাকা দিতে অস্বীকার করলাম, সে শাসিয়ে গেল—টাকা কি করে আদায় করে নিতে হয়, আমি জানি। তখন টাকা দিতে পথ পাবেন না।

এই দাপন লোধা থাকে কোথায়? ত্রিলোচনবাবুর প্রশ্ন।

এখন বোধহয় ভুজুডি কিম্বা শোংখারোতে আছে। মাঝখানে চন্দ্রপুরায় একবার দেখা হয়েছিল, আমি পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলুম, সে কাছে এসে বললে—বিশ্বাসবাবু না? শীগ্‌গিরই ব্যবস্থা হচ্ছে আপনার কাছ থেকে টাকা আনাবার, টাকা জোগাড় করে রাখুন, রেডি থাকুন। এই বলে দাপন লোধা চলে গেল।

দারোগাবাবু মিঃ বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসা করলেন—চন্দ্রপুরা পেপার মিলের কুলি-সর্দার ছিল যে লোধা—তার কথা কি বলছেন?

হ্যাঁ।

দারোগাসাহেব ত্রিলোচনবাবুর দিকে ফিরে বললেন—হ্যাঁ, অত্যন্ত শয়তান টাইপের লোক, খুন, রাহাজানি, ডাকাতি, ছিনতাই—হেন অপরাধ নেই যা সে করে না। পুলিশের কাছে অপরাধীর তালিকায় গোড়ার দিকেই তার নাম, তাকে তো ধরার চেষ্টা হচ্ছে, বিহার পুলিশ

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর—তাকে তো খুঁজে বেড়াচ্ছে।

মিঃ বিশ্বাস বললেন—তু-নম্বরে আমি কোনো একজনের নাম করবো না, একটা দলের নাম করবো—যার রিং লিডার হলো মুকুন্দ রাঠোর নামের এক মধ্যভারতের লোক, জানিনা চম্বলের বাসিন্দা কিনা, বা চম্বল অঞ্চলের ডাকাত কিনা। তার একটা দল আছে, ট্রেনে ডাকাতি করে, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা লুঠ করে। আমার সঙ্গে একবার আসানসোলে এই মুকুন্দ রাঠোরের দেখা হয়। সে আমাকে দেখেই বলে—আমি চিনি আপনাকে, আমার দলের কিছু লোককে কাজ দিতে হবে, মাইনে তাদের দিন বা না দিন, তারা কিছু দাবী করবে না, শুধু আপনি আপকার গার্ডেনসে যে মে-ফ্লাওয়ার কোম্পানীর চারতলা একটা বাড়ী বানাবার কাজ নিয়েছেন, সেই কাজে আমাদের লোক নিয়োগ করতে হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম—মাইনে ছাড়া কেন আপনার লোক আমার ওখানে খাটতে চাইছে। সব কারণ আপনার জানার দরকার নেই! আমার অধীনে কাজ করবে যারা—তাদের সম্পর্কে আমি কিছু জানবো না—তা কি করে হয়? রাঠোর তখন স্পৃষ্ট করেই বলে যে মে-ফ্লাওয়ার কোম্পানীর ব্যাপারে তার আগ্রহ, তার শ্রমিকেরা কাজ পেলে ওই কোম্পানী সম্পর্কে সব কিছু জানার সুবিধে হবে। কাজটা অছিলা মাত্র। ওদের ওখানে কাজ চাই। বলা বাহুল্য, আমি ত' রাজী হলামই না, উপরন্তু মে-ফ্লাওয়ার কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজারকে ঘটনাটি জানিয়ে দিলাম। ঠিক এর পরদিনই মুকুন্দ রাঠোরের কাছ থেকে ছোট একটা চিরকুট পেলুম—যে ক্ষতি আপনি করেছেন মিঃ বিশ্বাস, তা একদিন আপনার কাছ থেকে পূরণ করে নেব। ব্ল্যাকমেল করেই হোক, আপনার ছেলেমেয়েকে কিডন্যাপ করেই হোক—আপনার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করে নেবে আমার দল। গেট রেডি ফর ছাট। আপনার ওপর আমাদের শ্যেন দৃষ্টি থাকবে।

আমি তৈরি হয়েই আছি—এ রকম একটা বিপদের মধ্যে আমাকে পড়তে হতে পারে। তবে দুঃখ এই এর সঙ্গে অন্য আট দশটা ছেলে কেন জড়িয়ে পড়বে?

ত্রিলোচনবাবু একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন—আপনি ধরেই নিলেন যে মুকুন্দ রাঠোরের দলই স্কুলবাসটা হাইজ্যাক করেছে?

মিঃ বিশ্বাস নিরাসক্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন—না, যে বস্তু অনুমানসাপেক্ষ—তার সম্পার্কে এমন জোরের সঙ্গে আমি কিছু ব্যক্ত করতে পারি না। দাপন লোধা আর মুকুন্দ রাঠোরই ত' শুধু আমার শত্রু নয়, আরো দু চারজন আছে, তবে মনে হয়—তারা আমার সঙ্গেই শত্রুতা করবে, ছেলেকে ধরে নিয়ে যাবে না। তারা সমানে সমানে লড়তে চায়।

দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—তারা কারা?

ত্রিলোচনবাবু দারোগাসাহেবকে নিরস্ত করার উদ্দেশ্যে বললেন—আপাততঃ তাদের বিষয় এখন কিছু জানানোর দরকার নেই। তার চেয়ে বরং মুকুন্দ রাঠোরের বিষয়েই আমাদের মনোযোগ দেওয়া দরকার। সে মিঃ বিশ্বাসকে বলেই দিয়েছে যে তার দল মিঃ বিশ্বাসকে ছাড়বে না, হয় তাকে না হয় তার ছেলে বা মেয়েকে ধরে নিয়ে টাকা আদায় করবে। মুকুন্দ রাঠোরের সঙ্গে আপনার লাস্ট কবে দেখা হয়েছে?

ঠিক মনে পড়ছে না?

নির্দিষ্ট তারিখটা মনে না থাক, তবু কতদিন আগে তাকে দেখেছেন—তা বলতে প্রারেন না।

বছরখানেক আগে—তাকে আমি দেখেছি।

কোথায়?

ধানবাদ রেলস্টেশনে। আমি ধানবাদ থেকে ঝরিয়া যাবো বলে প্ল্যাটফরমে গেছি, দেখি মুকুন্দ রাঠোর দুজন লোকের সঙ্গে



দাঁড়িয়ে কথা বলছে। আমাকে সে দেখতে পায়নি। আমিও তাকে না দেখার ভান করে অন্যদিকে তাকাতে লাগলুম। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, মুহূর্তের মধ্যেই মুকুন্দকে আর দেখা গেল না। বোধহয় সে আমাকে দেখে থাকবে, আর আমাকে দেখেই সে গা ঢাকা দিয়েছে।

ত্রিলোচনবাবু কি যেন ভেবে নিলেন—তারপর মিঃ বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসা করলেন—মুকুন্দ রাঠোরের কোনো ফটো আছে আপনার কাছে, আমাকে একবার দেখাতে পারেন?

না, তার কোনো ফটো নেই।

তাকে দেখতে কেমন?

সাধারণ লোকের মতো। ফর্সা গায়ের রঙ, লম্বা চওড়া মানুষ, টানাটানা হিন্দিতে কথা বলে, মারাঠী ভাষায়ও সে বেশ দক্ষ। বাঁ চোখের কোলে একটা দাগ আছে।

দাপন লোধার ফটো আছে?

না, তারও কোন ফটো নেই।

বিশ্বশুদ্ধ, শত্রু করে রেখেছেন, কিন্তু তাদের ছবি তুলে রাখেন নি।

মুকুন্দ রাঠোরের ছবি আমি আপনাদের জোগাড় করে দিতে পারি। মে-ফ্লাওয়ার কোম্পানীর ম্যানেজার একবার আমাদের সকলের একটা বড় ফটো তোলেন, তাতে আমি ছিলুম, মুকুন্দ রাঠোরও ছিল। সেই ফটোর একটা কপি আনার চেষ্টা করতে পারি। এতদিন পরে যদি ঐ ফটোর আর কোনো কপি না পাওয়া যায়, তবে হয়তো দেওয়াল থেকে ফটোখানা খুলে আনার অনুমতি পেতে পারি, আপনাদের দেখা হয়ে গেলে পরে ওটা ফেরত দিলেই চলবে।

আপনি সেই চেষ্টাই করুন—মুকুন্দ রাঠোরের একটা ফটো আমাদের দরকার হতে পারে।—এই কটি কথা বলে ত্রিলোচনবাবু থানার ভেতরদিককার একটি ঘরে চলে গেলেন।

আমরাও থানা থেকে বেরিয়ে এলাম। মিঃ বিশ্বাসের এই সব

কথা কতদূর সত্য, এবং তাঁকে কতদূর বিশ্বাসভাজন লোক মনে করা যেতে পারে—সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ হতে লাগলো। মিঃ বিশ্বাসও আমাদের কাছ থেকে দ্রুত বিদায় নিয়ে গেলেন, বলে গেলেন—বাড়ী গিয়েই তিনি এই রাতে বেরিয়ে পড়বেন, কাল দুপুরের মধ্যেই মুকুন্দ রাঠোরের ফটো নিয়ে আসবেন।

রাতুলদা আর কৃষ্ণমূর্তি দু-একটা কথা বলে পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। পুলিশ আর গোয়েন্দার কথা শুনে রাতুলদার একটা ধারণা হয়েছে যে ত্রিলোচনবাবু শুধু সান্ত্বনা দেবার জন্যে ছেলেগুলি নিরাপদে কোথাও আটকা আছে তা বলেছেন। বংশীর সঙ্গে কথা বলে তিনি নিশ্চয়ই বুঝেছেন যে মাধু সিং লোক ভালো, সে কখনো কোনো দুষ্কার্য নিজে তো করবেই না, অন্যের দুষ্কর্মে মদত জোগাবে না। শুধু ব্যাকুল হতভাগ্য পিতাদের স্তোক ও সান্ত্বনাদানের জন্যেই ত্রিলোচনবাবু ঐ সব সম্ভাবনার কথা বলে থাকবেন। তবে তিলুড়ির হ্রদে যদি গাড়ীশুদ্ধ ডুবে যায়—তা হলে তো আর কিছু আশা নেই, দারোগাবাবুর কাছ থেকে এমন ইঙ্গিতও পাওয়া গেল।

মনটা খুবই ভার হয়ে গেছে।

বাইরে বেরিয়ে এসে বুঝলাম—বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। পাহাড়ী জায়গায় রাত্রে এ সময়টা খুব শীত পড়ে। চারিদিকে আবছা ধোঁয়ার পাতলা আস্তরণের মতো কুয়াশা নেমেছে; দূর থেকে মনে হয় প্রকৃতি যেন সারাদেহে ফিকে ছাই রঙের একটা হাল্কা চাদর জড়িয়ে ঝিমোচ্ছে। নিস্তব্ধ রাত্রি—আমাদের গাড়ী দুটো লম্বা আলো ফেলে খুব আস্তে আস্তে চলতে লাগলো, তখনো মনে আশা—যদি পথের পাশে কোথাও বাচ্চাদের দেখা মেলে, যদি তাদের কারুর করুণ কান্নার শব্দ শোনা যায়—যদি স্টেশন-ওয়াগনের কোনো চিহ্ন ব্যাকুল চোখে পড়ে যায়—

আশা যে মানুষকে কিভাবে জড়িয়ে থাকে!

তিলুড়ির মোড় একদম ফাঁকা, কৃষ্ণমূর্তি এখান থেকে লুন্টির পথে বেঁকে চলে গেছেন। রাতুলদা আর আমি গাড়ীতে কোনো কথা বলতে পারিনি। সারা পথ চুপ করে এলাম। গভীর শোক মানুষকে মূক করে দেয়, অভিব্যক্তি কেড়ে নেয়; আমরা শুধু যন্ত্র চালিতের মতো নিতান্ত মূঢ়ভাবে নড়াচড়া করছিলাম।

রূপজামে যখন আমরা ফিরলাম, তখন সেখানে বিষণ্ণতা থম থম করছে, করুণ বিষাদে শীতের রাত্রিটা বেশ ভারী বলে মনে হলো। শোক যে কেমন বাস্তব আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে প্রত্যক্ষরূপ নিতে পারে, তা এই পরিবেশে পড়ে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। এই রূপ-জামের মানুষগুলোকে ক'দিন থেকেই দেখছিলাম হাসিখুশিতে, গল্পগুজবে, গানবাজনায় কেমন উচ্ছল আর প্রাণবন্ত ছিল, কিন্তু আজ সন্ধ্যা থেকেই কেমন যেন মুষড়ে পড়েছে, অসহায় কারুণ্যে মুহুর্মুহু শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলছে! রাত্রিও যেন এখানকার মানুষগুলির বেদনার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে নিথর হয়ে চুপ করে রয়েছে। গোটা প্রকৃতির মধ্যেও মনে হচ্ছে চাপা শোকের একটা ছায়া পড়েছে।

ঘড়ির কাঁটার টিকটিক শব্দের সঙ্গে পা মিলিয়ে মিলিয়ে অতি ধীরে ধীরে সেই শোকের রাতও শেষ হলো। পূর্বদিকে দূরে বড় ধেমো পাহাড়ের ওপাশের আকাশে রূপোলি আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ী বাড়ী খবর চালাচালি করা হলো—রাত্রে কোন চিঠি কেউ পেয়েছে কিনা, শুধু চিঠি কেন—ছেলেদের বা মাধু সিং—কারুর কোন সংবাদ পাওয়া গেছে কিনা!

না, ভোরবেলা পর্যন্ত কোথাও কোনো খোঁজ-খবর পাওয়া যায় নি। সকলেই সজাগ ছিলেন, কোনো সংবাদ এসে পৌঁছয় নি। মিঃ বিশ্বাসের বাড়ীতেও কোনো চিঠি আসেনি, তিনি গত রাত্রে থানা

থেকে ফিরেই মে-ফ্লাওয়ার কোম্পানীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছেন—মুকুন্দ রাঠোরের ফটো আনতে।

রাতুলদার বাড়ীতে কে যেন এসে খবর দিলে—তিলুড়ীর জলে আজ লোক নামানো হবে, গত রাত্রে রোটাংডি থানায় সেই মর্মে কথাবার্তা হচ্ছিল—আমরা শুনে এসেছি। আমাদের কাছ থেকে কিছু জানার আগেই রূপজামের সকলেরই কাছে খবর গেল—তিলুড়ীর হ্রদে জলপুলিশ আর ডুবুরি নামবে। সুতরাং রূপজাম ছেড়ে তিলুড়ীর দিকে চললো সবলে। উদ্বেগ আর কিছুটা যেন কৌতূহলও দেখা গেল—মানুষের মধ্যে। জলে ডোবা স্কুলবাস কি করে জলের তলা থেকে ডাঙায় তুলবে—তা চোখে দেখতে একটা ইচ্ছা যে না আছে—এমন নয়।

রাতুলদা এক কাপ চা খেয়ে নিলেন, আমাকেও চা দেওয়া হলো। সারারাত ঘুম হয়নি, শীতের ভোরে চা খুব উপাদেয় ঠেকলো। চা-য়ের সঙ্গে অন্য কিছু খাবো কিনা—জিজ্ঞাসা করা হলো।

না, শুধু চাতেই হবে। এখন কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।

রাতুলদা বললেন—কাল সন্ধ্যে থেকেই তো উপোস যাচ্ছে, একটু কিছু মুখে দিয়ে নে না-হয়।

না, কিছু খাবার একদম ইচ্ছে হচ্ছে না। বাচ্চারা কাল থেকে হয়তো কিছু খেতে পায় নি।

বাচ্চাদের কথায় পরিবেশটা আবার ভারী হয়ে উঠলো। সকলের মনের মধ্যে ওই একটা কাঁটা ফুটে রয়েছে।

সকাল সাতটার মধ্যেই মাইথন থেকে জলপুলিশের একটা বড় দল তিলুড়ী হ্রদের তীরে এসে হাজির হলো। যদি জলে গাড়ীটা ডুবে গিয়ে থাকে, তবে তাকে টেনে তোলার জন্যে ক্রেনজাতীয় বেশ কিছু যন্ত্রপাতি এসে পড়েছে। ইয়া বড় লরি এসেছে কয়েকটা—নানারকম যন্ত্র নিয়ে, তিলুড়ীর হ্রদের এদিকটায় জল-পুলিশের

লোকেরা তদারকি করছে। মাইথনের জলপুলিশ এসেছে, ধানবাদ থেকেও পুলিশফৌজ এসেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ লেভির কুশলী দলও পৌঁছে গেছে।

পুলিশ কর্তৃপক্ষের ধারণা কি বাসশুদ্ধ ছেলেরা সলিল-সমাধি লাভ করেছে তিলুড়ীর জলে? যদিও কোথাও কোনো চিহ্ন নেই—ভাবতে গেলেও দম আটকে যায়।

কাল রাতে দারোগাসাহেব এবং ত্রিলোচনবাবু তবু কিছু আশার কথা শুনিয়েছিলেন—ছেলেগুলোকে আটক রেখে মাধু সিং বা তার দল বা অন্য কেউ টাকা আদায়ের ফন্দী আঁটছে!

আর, আজ সকালে এ কি কাণ্ড! তিলুড়ী হ্রদের জলে স্টেশন-ওয়াগন ডুবে গেছে বলে ধরে নিয়ে তার ব্যবস্থা করতে হ'লো?

কি করে যেন খবরটা রটে গেল, তিলুড়ী হ্রদের জল থেকে ডুবে-যাওয়া স্কুল বাসটা তোলা হচ্ছে, কত বড় বড় যন্ত্র এসেছে। লোক জমতে দেরী হোলো না। রাটাডির কিছু লোক, রূপজামের প্রায় সকলে, লুটি তিলুড়ী—সব জায়গা থেকেই বেশ কিছু কৌতূহলী লোক তিলুড়ীর জলের ধারে এসে জমায়েত হলো। জলে যদি গাড়ীটা ডুবেই থাকে—তবে তাকে ক্রেনের সাহায্যে টেনে তুললে তখন কি দৃশ্য দেখা যাবে? লোকের মনে কৌতূহল যতটা, তার চেয়ে ঢের বেশী বিষণ্ণ কারুণ্যের একটা গভীর অনুভূতি।

রূপজাম থেকে কিছু মহিলাও এসেছিলেন। মায়ের প্রাণ, মরা ছেলেকে দেখেও যদি একটু সান্ত্বনা মেলে! সারারাত কেঁদে কেঁদে তাদের চোখ মুখ ফুলে গেছে—

গভীর জলে যদি কিছু ডুবে যায়—জলের তলায় কি করে খোঁজ চালাতে হয়—তার সরঞ্জাম দেখলাম। কাঠের পাটাতন বিছানো হলো চ্যাপ্টা পান্সী নৌকোর মতো করে। তীরের কাছে ক্রেন বসানো হলো। নৌকোর মতো ওই পাটাতনের পাশ থেকে একটা যন্ত্রের মধ্যে সেই ক্রেনের চেন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জলের তলায় নামিয়ে

দেওয়া হলো। আমার বলতে হয়তো ছ' মিনিট সময় লাগছে, কিন্তু ক্রেন ঠিক করতে কম পক্ষে ঘণ্টা খানেক কি তার কিছু বেশী সময় লেগেছিল।

সেই দেড়ঘণ্টা পৌনে দু ঘণ্টা সমস্ত মানুষ একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে সাংঘাতিক ট্র্যাজেডির শেষ দৃশ্য দেখবার জন্য বোধ হয় বুক বেঁধে থাকবে। কলিয়ারীর ভেতরে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে পিটের মুখে আত্মীয়-স্বজনেরা যেমন বেদনায় ভেঙে-পড়া মন নিয়ে অপেক্ষা করে থাকে, এখানেও কতকটা সেই রকম করুণ দৃশ্য।

সকলেই রুদ্ধশ্বাস হয়ে অপেক্ষা করছে, এতগুলি মানুষের সমাবেশ, শুধু যন্ত্রের যেটুকু আওয়াজ, তাছাড়া কোথাও কোনো শব্দ নেই। মানুষেরা নিশ্চুপ, শুধু পুলিশেরা আর ডুবুরি—যারা জলে নামছে, ক্রেন সরাচ্ছে, ধরছে—তাদের দু-একটা কথাই ধ্বনিত হচ্ছে। পাতালপুরীর অতল অগম লোক থেকে কি দুঃসংবাদ আসে—তাই শোনার প্রতীক্ষায় সকলে চুপ করে আছে।

দারোগারবাবু নিজেদের লোকের মধ্যে কথা বলতে শুরু করলেন—সময়মতো ক্রেন পাওয়া আর ইণ্ডিয়ান নেভির লোকজনদের সাহায্য মেলা—খুবই সৌভাগ্যের লক্ষণ। আর ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন, তখন আমাদের কোনো দুশ্চিন্তা নেই।

দুশ্চিন্তা বলতে দারোগাবাবু কি বোঝাতে চাইছেন—তা আমরা ধরতে পারলাম না। ত্রিলোচনবাবু মাথা নেড়ে দারোগাবাবুর কথায় সায় দিলেন বটে, তবে তাঁর দৃষ্টি তখন ক্রেনের দিকে। তিনি নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে এসে জলের ধারে গেলেন, পরিষ্কার গলায় জিজ্ঞাসা করলেন—জলের তলায় কিছু ঠেকছে কি?

ত্রিলোচনবাবু কণ্ঠস্বরে ঈষৎ উদ্বেগের সুর ছিল। ক্রেনম্যান প্রথমটা ত্রিলোচনবাবুর কথায় কোনো গুরুত্ব দেয়নি, নিজের একাগ্রতা নিয়েই কাজ করে যাচ্ছিল, তারপর যখন বুঝলো যে ইনি একজন হোমরা চোমরা জাতীয় কেউকেটা, তখন ক্রেনম্যান পান্সীর মতো

পাতা কাঠের পাটাতনের ওপর থেকে জবাব দিলে—হ্যাঁ, স্যার নীচে কিছু আছে, বেশ ভারী রকমের কিছু আছে, ক্রেনের মুখটা যেখানে ঠেকছে—সেখানটায় ভারী কিছু একটা আছে।

ভারী মানে?

খুব বড় একটা কিছু।

কোনো বাসগাড়ী বলে মনে হচ্ছে?

তা কি করে বলবো? নেভির ডুবুরি আছে—তারা দেখে আসবে। ক্রেনের সাহায্যে আমরা জায়গাটা বলে দিতে পারি। তার বেশী কিছু কি করে বলবো। চোখের সামনে যত ভারী জিনিস দেন, তাকে সরিয়ে নড়িয়ে দিতে আমাদের কোনো কষ্ট নেই, কিন্তু চোখের সামনে যা নেই—তার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানও ঠিক নয়।

না, ভারী জিনিস একটা রয়েছে—বললে না, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। কি করে বোঝা গেল যে ওটা ভারী জিনিস?

ক্রেন নিয়ে কাজ করলে, চেনের লম্বা দিকটা কত মিটার তা জানলে, আর কত পাওয়ারে চেনটা ওই জিনিসকে ধরতে চেষ্টা করছে জানতে পারলে মোটামুটি বোঝা যায়—জিনিসটা কেমন ভারী। জলের নীচে যে জিনিসটা রয়েছে—তা এত বড় যে চট করে তাকে বাগ মানাতে পারছি না। ডুবুরি নামলে সব জানা যাবে।

ভারীবস্তু একটা জলের তলায় আছে ক্রেনম্যানের এই খবরটা ছড়িয়ে পড়তে দেরী হলো না। কৃষ্ণমূর্তি তো এই খবর শুনে শোকে দুঃখে পাগলের মতো হয়ে পড়লেন। রাতুলদা নিজেও শোকাহত, তবু তিনি কৃষ্ণমূর্তিকে বোঝাতে লাগলেন—ভারী জিনিস মানে যে স্কুল বাস—একথা কেন ভাবা হচ্ছে। মাধু সিং কখনোই গাড়ী চালিয়ে জলে ঝাঁপ দেবে না, এই যে হ্রদের জল তোলপাড় করে খোঁজা হচ্ছে—আসলে এ পণ্ডশ্রম হচ্ছে।

আমারও তাই মনে হচ্ছে। আমিও কৃষ্ণমূর্তিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—জলে বাসটা পড়েনি—এ আমি লিখে দিতে পারি।

ঠিক সেই মুহূর্তে ক্রেনম্যানেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল—ভারী জিনিসটা হতেও পারে স্কুলবাস।

কথাটা আমার কানে গিয়েছিল। ক্রেনম্যান বলে কি—স্কুলবাসটা জলে গিয়ে পড়েছে, যারা এই কথাটা শুনতে পেয়েছিল, তারা কেঁদে উঠলো।

দেখলাম কাঠের পাটাতন থেকে তারবাঁধা একটা ফাঁপা পাঁউরুটি জলের তলায় ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঐ পাঁউরুটিটা পারা বোঝাই, জলের ভেতর কিছু ডুবে থাকলে বোঝাবুঝির জন্যে পারদের এই রকম ব্যবহার করা হয়। জলের তলায় ডোবা নৌকো, লঞ্চ বা জাহাজের খোঁজে এই রকম কত ব্যবস্থাই যে আজকাল হয়েছে।

মুখে যাই বলি না কেন, কৃষ্ণমূর্তিকে যে ভাষাতেই অভয় দেবার চেষ্টা করি না কেন—আমাদের মনের মধ্যে ভয় আর ব্যাকুলতা চেপে বসে আছে। আশে পাশে যার দিকেই দেখছি, সকলের মুখ দেখে মনে হচ্ছে ভয়ে তাদের বুক কাঁপছে। করুণতম ঘটনার সাক্ষী হতে মন চাইছিল না, বিশ্রী, ভারী, বিষন্ন কেমন একটা অনুভূতিতে মন ভারাতুর। অথচ প্রকৃতির মধ্যে কোথাও কোন বিষাদের চিহ্ন নেই। রোদে চারিদিক ভরে গেছে, চকচকে রুপোলী রোদ যেন অন্যদিনের তুলনায় আজ একটু বেশী রকমের উজ্জ্বল বলেই মনে হলো। আকাশও বেশ পরিষ্কার, নির্মেঘ, নীল। এই যে কাল সন্ধ্যায় এতবড় একটা সর্বনাশা, করুণ বিপর্যয় ঘটে গেল—প্রকৃতির সেদিকে কোন খেয়াল নেই। ভারী আশ্চর্য লাগে—এতগুলি লোকের বেদনার স্বল্পতম সাক্ষ্যও প্রকৃতি গায়ে মাখলো না, তার প্রকাশে এই বিষন্ন বিপর্যয়ের কোনো স্পর্শ লাগেনি।

পারা বোঝাই পাঁউরুটিখানা জলের তলায় পৌঁছে কিছু সংকেত জানালো নাকি? উদ্বেগে, আগ্রহে, বেদনায়—অর্ধমৃত বাক্‌শক্তি রহিত সেই মানুষগুলির বুকের ঢিব্‌ঢিব্ আওয়াজ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। এমনই স্তব্ধ হয়ে সবাই অপেক্ষা করছে—সময় বুঝি নিশ্চল হয়ে

এখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে। জমাট বাঁধা এক মহান্ বেদনা শুধু মূর্ত হয়ে উঠেছে। আসন্ন ক্রন্দনের নির্ঘোষে এই মূক স্তব্ধতা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে পড়বে, ঝড়ের আগেকার থমথমে আকাশের মতনই ভারী আমাদের মন।

নৌবাহিনীর দক্ষ লোকের যে দলটা এসেছিল—সেই দলের সবাইকে দেখলাম পারাবোঝাই ওই পাঁউরুটিটা যেখানে ডোবানো হয়েছিল—সেখানে তাকিয়ে থাকতে। আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না, যদিও সেখানটায় আমরাও দৃষ্টি দিচ্ছি। একটু পরেই দেখলাম নৌবাহিনীর লোকদের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য দেখা গেল। তাদের মধ্যে থেকে জন দুয়েক ডুবুরি পারাবোঝাই পাঁউরুটি থেকে কি সঙ্কেত পেয়ে ঝুপ ঝাপ জলে লাফিয়ে পড়লো। জলে লাফাবার আগে মুখোস এঁটে নিলে, অক্সিজেন নেবার জন্যে নাকে নল পরে নিলে, পিঠে গ্যাস বোঝাই ছোট লম্বাটে সিলিণ্ডার বেঁধে জলের অতলে ডুব দিলে।

তীরে দাঁড়ানো সব মানুষের ব্যাকুল প্রত্যাশা, মেয়েদের কণ্ঠে চাপা কান্না, পুরুষদের রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা। মরণযজ্ঞের অসহায় অরক্ষিত সাক্ষীর মতো উপস্থিত কৌতূহলী জনতার নিঃশব্দ অবস্থান, সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল যেন মহাকালের কোনো অশুভ সঙ্কেতের জন্যে সকলে দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে, চরম সর্বনাশের ঘণ্টাধ্বনি শোনার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে রয়েছে।

ঠিক মিনিট কুড়ি কি পঁচিশ মিনিট কেটেছে নৌবাহিনীর ডুবুরি নামার পর—হঠাৎ একজন ডুবুরি জলের তলদেশ থেকে উঠে এল খুব দ্রুত; তাকে দেখে মনে হলো সে যেন খুব ভয় পেয়েছে; মুখোস খুলে, নাক থেকে নল বের করে সে হাঁফাতে লাগলো। তার মুখে চোখে বীভৎস রকমের একটা আতঙ্কের চিহ্ন। জলের তলায় কি সে উপলব্ধি করে এল? সেখানে স্কুলবাসটার খোঁজ পেয়েছে নাকি সে?

একটু সুস্থ হয়ে সে যা বললে—তা যেমন ভয়াবহ, তেমনি অবিশ্বাস্য। সে বললে—ডুব দিয়ে তলায় যাচ্ছি, এমন সময় আমার বাঁ পা-টা ধরে কে টান দিলে! জলের মধ্যে আমার পা ধরে টানবে কে? কুমীর না হাঙর? না, সাপ জড়িয়ে ধরেছে? জলের জন্তুকে আমরা ভয় করি না, আমাদের এই পোষাক ভেদ করে দেহের কোনো ক্ষতি তারা করতে পারবে না! কিন্তু পা ধরে টানছে কে? বেশ বড় একটা হাত দিয়ে আমার বাঁ পা-টা টেনে ধরেছে। জলে ডুবে যারা মরে যায়,—তাদের অনেকেই ভূত হয়, অপঘাতে মৃত্যু কিনা! আমি ভয় পেয়ে গেলাম, কোনোরকমে তার হাত থেকে পা-টা ছাড়িয়ে নিয়ে সোজা ওপরে উঠে এলাম।

এই কথায় সকলের মধ্যে চাঞ্চল্য জাগলো বটে, তবে কারুর শোক যে গাঢ়তর হয়ে বাজলো—এমন নয়। ঠিক সেই সময় নৌবাহিনীর অপর ডুবুরি জলের তলা থেকে ভেসে উঠলো। তীরে এসে সে মুখোস খুলে, নাক থেকে নল নামিয়ে তাড়াতাড়ি বললে—এই অঞ্চলের তলাটা সব খুঁজেছি, শুধু একটা মানুষের পা ধরতে পেরেছিলাম, তা সে ওই স্কুলবাস ড্রাইভারের কিনা জানি না, কিন্তু হাত ফস্কে সে কোথায় যেন পালালো। তাকেও আর খুঁজে পাওয়া গেল না। এই জলে কি কোনো অপদেবতার লীলা আছে নাকি?

প্রথম নম্বর ডুবুরি এবং দ্বিতীয় ডুবুরি যা যা বললেন—তাতে ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা গেল। এই দ্বিতীয় ডুবুরিই জলের মধ্যে প্রথম ডুবুরির পা ধরেছিল, প্রথম লোকটি ভয় পেয়ে ওপরে উঠে এসেছে। দ্বিতীয় লোকটির সাহস বেশী, সে আরো কিছুক্ষণ জলের তলায় ছিল। যে দিকটায় ক্রেন নামানো হয়েছে, সে দিকে ডুবুরির দল নামে নি।

এমন সময় মিঃ বিশ্বাস সেখানে এসে হাজির। তিনি রোটাংডি থানা ঘুরে আসছেন। থানা থেকে সে দাপন লোধা আর মুকুন্দ রাঠোরের কথা কিছু শুনে এসেছেন এবং দারোগাবাবু এবং ত্রিলোচনবাবু

যে তিলুড়ী হ্রদের তীরে আছেন—তা জানতে পারেন।

ত্রিলোচনবাবু মুকুন্দ রাঠোরের ফটো দেখে বললেন—এতো বলিরাম সর্দার। খুনের দায়ে জেলে সে কয়েদ খাটছে মাস ছয়েক। তার দলের লোকজন সবাই এখন জেলে। সুতরাং বলিরামকে বাস লোপাটের ব্যাপারে জড়ানো ঠিক নয়। বলিরামই নানা অপকার্যে নানা নাম নিয়ে থাকে। এই বলিরামই মুকুন্দ রাঠোর বলে পরিচিত।

থানায় মেজবাবুও সে কথা বললেন। মিঃ বিশ্বাসের উক্তি। থানা থেকে মিঃ বিশ্বাস দাপন লোধা সম্পর্কে যা শুনে এসেছেন, সে কথাও জানা গেল। দাপন লোধাও এ ব্যাপারে জড়িত বলে পুলিশমহলের কারুরই মনে হয় নি। দাপন লোধাকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে তার দলের শ্রমিকেরা—প্রায় মাস ছয়েক আগে। বিহার সরকারের গোপনীয় তথ্য সরবরাহ বিভাগের মারফৎ রোটাংড়ি থানার লোকেরা জেনেছেন। সুতরাং দাপন লোধাকে সন্দেহ করার কোনো মানেই হয় না'!

মিঃ বিশ্বাসের কথা শেষ হতেই আবার নিস্তব্ধতা। শুধু ক্রেনের নড়াচড়ার সামান্য একটু আওয়াজ।

ক্রেনম্যান একটু আগে বলেছিল—জলের তলায় ভারী একটা কিছু আছে। তখন থেকে আমাদের মনটা কেমন যেন দমে গিয়েছিল। সেই ভারী জিনিসটা তোলার জন্যে চেষ্টা হচ্ছে। আমরা রুদ্ধবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

হঠাৎ সেই নিস্তব্ধতা খান খান করে দিয়ে দূর থেকে সাইরেনের আওয়াজ করতে করতে একটা জিপ গাড়ী সেখানে এসে হাজির হলো। পুলিশের গাড়ী। জরুরী বার্তা নিয়ে পুলিশের এক জুনিয়র অফিসার ত্রিলোচনবাবুর কাছে এসেছে।

এ দিকে সকলে মনোযোগ যাবার আগে বোঝা গেল যে ক্রেনে একটা ভারী কিছু উঠছে। ক্রেনম্যান সেই রকম আভাস দিয়েছে। সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে। পাটাতনের ওপর

জল পুলিশের লোক রয়েছে—তারা তীরের লোককে একটু পেছিয়ে দাঁড়াতে বলছে। দারোগাবাবু ক্রেনের সাহায্যে জলের তলদেশ থেকে কি ওঠানো হচ্ছে—তা দেখছিলেন।

সকলের ঔৎসুক্য আর কৌতূহল নিরসন হলো—যখন দেখা গেল যে ক্রেনের সাহায্যে মস্ত বড় একটা পাথরের চাঁই তোলা হয়েছে। না, স্কুলের সেই স্টেশন-ওয়াগন নয়, মাধু সিং আর বাচ্চারা বোধহয় জলের তলায় ডোবে নি।

পুলিশের গাড়ী থেকে সাব্-ইন্স্পেক্টর জাতীয় একজন অফিসার নামলেন; ত্রিলোচনবাবুর কাছে এসে বেশ নীচু স্বরে কি সব বলতে লাগলেন। দারোগাবাবু ক্রেনম্যানের কাজ দেখে কিছুটা যে হতাশ না হয়েছিলেন—এমন নয়, স্কুলবাস জলের তলায় এই খবরটা পাকাপাকি জানা হলেও বা কথা ছিল। শেষে কিনা একটা বড় পাথরের চাঁই উঠলো।

ত্রিলোচনবাবু দারোগাবাবুকে ইশারায় ডাকলেন, উভয়ের মধ্যে নিম্নস্বরে দু-একটা কথা হবার পরই দারোগাবাবু কৃষ্ণমূর্তিকে কাছে ডাকলেন।

আমিও কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে দারোগাবাবুর কাছে গেলাম। ত্রিলোচনবাবুর সাব্-ইন্স্পেক্টরের কথোপকথন আমার কানে কিছুটা এল। দারোগাবাবু বললেন—ছেলেরা সুস্থ আছে, মাধু সিং-এর খবর পাওয়া গেছে, চন্দ্রপুরা থানায় সে আজ প্রত্যুষে গেছে। আপনারা অপেক্ষা করুন—বাচ্চাদের নিয়ে স্কুলবাস এখানে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যে।

মাধু সিং-এর খোঁজ পাওয়া গেছে? রোটাংডির মাধু সিং স্কুলের স্টেশন-ওয়াগন চালায় যে—

ছেলেরা? ছেলেরা সবাই ভালো আছে তো? আমাদের খোকা?

অপ্রত্যাশিত এই খবর কতক্ষণ পরে বাস্তবের মূর্তি ধরে প্রত্যক্ষ হবে?

আমার আগ্রহ আরও বেড়ে গেল—ত্রিলোচনবাবু আর ওই পুলিশের অফিসারটির কথা শুনতে। দারোগাবাবুও তাঁদের কথায় যোগ দিয়েছিলেন।

ত্রিলোচনবাবু বলছিলেন—আমি বরাবর বলেছি গাড়ীটা জলে পড়েনি, কিন্তু আপনাদের ধারণা জলেই ডুবেছে গাড়ী। সে ব্যবস্থা বিকল্প করেছেন, এটা অবশ্যই হয়—এসব ক্ষেত্রে। তিলুড়ির মোড়ে ওই পেট্রল পাম্পের দোকানে চোখ রাখতে বলেছিলাম কেন—তা তো আগেই বলেছি। গাড়ী চুরি করে যারা, অনেক সময় পেট্রল পাম্পের দোকানের মালিক বা কর্মচারীর সঙ্গে যোগসাজস থাকে। এক্ষেত্রে অবশ্য তেমন কোনো কিছু ঘটেনি। মাধু সিং শুনছি নিজে থেকেই চন্দ্রপুরা থানায় উপস্থিত হয়েছে।

পুলিশ সাব্-ইন্সপেক্টর বললেন—সাধুবাদ জানাতে হয় মাধু সিংকে, খুব বুদ্ধি আর সাহসের পরিচয় দিয়েছে। চন্দ্রপুরা থানাও খুব সাহায্য করেছে ওকে—

আনন্দের একটা ঝিলিক অন্ধকার মেঘাক্রান্ত আকাশের বিদ্যুৎ চমকের মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, এতক্ষণ ছিল ভয়, উদ্বেগ শোকোচ্ছ্বাস,—এখন শুধু প্রতীক্ষা, কতক্ষণে হারানো মানিক ফিরে পাওয়া যাবে। চব্বিশ ঘণ্টা হতে চললো প্রায়—মা-বাবার কাছ-ছাড়া হয়ে আছে! যতই বলুক ছেলেরা ভালো আছে—সত্যিই কি তেমন ভালো আছে?

সাব,-ইন্সপেক্টর বললেন—হ্যাঁ, ছেলেরা সবাই ভালো আছে, তাদের সকলকে নিয়েই মাধু সিং এখানে আসছে। কোনো বাচ্চারই কিছু ক্ষতি হয় নি, সকলেই সুস্থ আছে, মোটামুটি খুশীও আছে সব। এখবর পাওয়া গেছে। থানায় মাধু সিং আর ছেলেদের এজাহার নেওয়া হচ্ছে, খুব সংক্ষেপে সে কাজ করা হচ্ছে, এজাহার লিখতে আর কতক্ষণ, এক্ষুণি সে রোটাংডি থানায় আসবে, তারপর সে যাবে রূপজামে। চন্দ্রপুরা থানা থেকে ফোনের খবর পেয়েই সে ছুটে

এসেছে এখানে খবরটা পৌঁছে দিতে।

মাধু সিং রোটাংডি থেকে রূপজামে যাবে যখন—তখন তাকে এপথ দিয়েই যেতে হবে, চন্দ্রপুরা থেকে রোটাংডি যাবে কোন্ পথ দিয়ে জানা যাবে না, লুন্টি এবং তিলুড়ির মোড় হয়ে যাওয়া যায়, আবার সাঁওতালডির নতুন সড়ক ধরেও যাওয়া যায়। কিন্তু রোটাংডি থেকে রূপজামে যেতে গেলে এই পথ ছাড়া আর অন্য রাস্তা নেই। সুতরাং সকলের চোখ এখন ওই পথটার দিকে, রোটাংডি থেকে কখন স্কুল-বাসটা আসে—তারই অসহ্য প্রতীক্ষা।

কোথায় ছিল মাধু সিং? ছেলেদের নিয়ে কোন্ পথেই বা সে অন্তর্ধান করেছিল, চন্দ্রপুরাতেই বা গেল কেন?

সকলের মনে স্বস্তির ভাব ফুটে উঠলেও ছেলেদের দেখার জন্যে ব্যাকুলতা বোধ হয় আরো বেড়ে গেল। এতক্ষণ খবরটুকু জানার ব্যাপারে মনে ছিল দুর্মর উদ্বেগ, এবার তাদের দেখার জন্যে মনটা ভীষণভাবে ছটফট করতে লাগল। পাহাড়ী জায়গায় শীতকালীন সকালের রোদের কেমন একটা নরম রঙ আছে; এতক্ষণে সেই রৌদ্রকরোজ্জ্বল উন্মুক্ত আকাশের তলায় প্রকৃতির সেই নরম রূপোলী রঙ খারাপ লাগলো না। বরং প্রকৃতির মধ্যে লক্ষ্য করা গেল কেমন একটা খুশী খুশী ভাব রয়েছে, দেখতে তা ভালই লাগলো। দুঃস্বপ্নের পর জেগে উঠে বাচ্চা যেমন তার মাকে দেখে আহ্লাদে ডগমগ হয়ে বড় বড় চোখ মেলে, জোরে আনন্দের নিঃশ্বাস ফেলে, তেমনি আমাদেরও বুকের ভার কমে গেল, হাল্কাভাবে আমরাও এতক্ষণে যেন একটু আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম! তবু বাচ্চাদের কতক্ষণে দেখতে পাবো—তেমন একটা অধীর অবাধ্য বোধ মনকে বার বার নাড়া দিচ্ছিল।

কিন্তু মাধু সিং এখনো আসছে না কেন? এত দেরী হচ্ছে কেন তার? গভীর জলের তলা থেকে ডুবে-যাওয়া জিনিস কেমন করে তোলে, তা দেখার কৌতূহল একটু আগে সব মানুষকে তাদের শোককে

সাময়িকভাবে ভুলতে সাহায্য করেছিল, এখন উদ্বেগ কিছুটা কমলেও প্রতীক্ষিত মনের কাছে সময় যেন অচল বলে মনে হচ্ছে !

আমিও ছটফট করছি--মাধু সিং কখন আসবে। দূরে কোনো মোটরের শব্দ হলেই কান খাড়া করে ভাবি—ওই বুঝি মাধু সিং আসছে। কিন্তু অন্য গাড়ী দেখে হতাশা বাড়ে চারগুণ।

কৃষ্ণমূর্তি বললেন—আমার গাড়ী রয়েছে, থানায় যাবো নাকি আমি একবার, চট করে ঘুরে আসবো ?

সকলে তাকে বারণ করলো, খবর যখন পাওয়া গেছে, তখন আর ব্যস্ততা কেন, মাধু সিং এক্ষুণি এসে পড়বে।

এই রকম অধীরতার মধ্যে সত্যি সত্যিই জনতা—কি মেয়ে, কি পুরুষ—সকলেই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো—ওই, ওই মাধু সিং আসছে, স্কুলের গাড়ী আসছে! ওই যে—ওই, ওই—

হ্যাঁ, হর্ণ শোনা যাচ্ছে তো। কোন ভুল নেই, সেই স্কুলবাসের হর্ণ, পরিচিত হর্ণ; অতি পরিচিত কাছের মানুষের কণ্ঠস্বর যেমন চেনা, স্কুলের গাড়ীটার হর্ণও তেমনি পরিচিত সবায়ের। এই স্টেশন-ওয়াগনের হর্ণ ভুল হবার নয়। মায়ের সকলের খুবই চেনা এই হর্ণ। তাদের অশান্ত বুক আশায় কাঁপতে লাগলো, ভয়ও হচ্ছিল—কেমন দেখবে তাদের বাচ্চাদের ? আহা, সারারাত এই শীতের সময় না জানি বাছাদের কত কষ্ট হয়েছে, খাওয়া হয় নি, ঘুম হয় নি, বাচ্চাদের মুখ শুকিয়ে গেছে—

তিলুড়ীতে বীরুয়ার চায়ের দোকানে এসে মাধু সিং বীরুয়ার কাছে এখানকার উদ্বেগের কথা শুনেই সে সোজা গাড়ী নিয়ে হ্রদের কাছে এসে হাজির হয়েছে। গতকাল বিকেল থেকেই সে কল্পনা করতে পারছিল—রূপজামে কেমন কান্নাকাটি হচ্ছে।

মাধু সিং-এর চেহারাও কেমন যেন ফ্যাকাসে; উদ্বিগ্ন, বিষণ্ণ এবং ব্যাকুল। চোখে মুখে কোনো জৌলুস নেই—

সকলেরই ব্যাকুল প্রশ্ন : ব্যাপার কি মাধু সিং? কোথায়



গিয়েছিলে তুমি গাড়ী নিয়ে কাল বিকেলে? একটা খবর তো দিতে হয়?

গাড়ী থামিয়ে মাধু সিং প্রথমে নেমে সকলের উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে প্রণাম করে বললে—ফিরতে যে পেরেছি—সে আপনাদের আশীর্বাদের জোর। আমাকে দম নিতে দিন, ধীরে ধীরে আপনাদের কাছে সব বলছি। বালবাচ্চারা সব ঠিক আছে, তাদের কোনো তকলিফ্ হয় নি। বড় বিপদে পড়েছিলাম আমরা—

মাধু সিং-এর কথা তখন শোনে কে। ছেলেরা হুড়্দাড়্ করে নেমে পড়েছে গাড়ী থেকে, মা-বাবার কোলে গিয়ে মুখ গুঁজে কেউ ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললে, কেউবা নির্বাক হয়ে গেল! আদরে সোহাগে, কান্নায় খুশিতে মেলামেশার এক জীবন্ত উজ্জল নাটক যেন! এ দৃশ্যটিও দেখবার মতো। পৃথিবীতে সন্তান স্নেহের মতো পবিত্র জিনিস বোধ হয় আর কিছু নেই। ছেলেকে কোলে জড়িয়ে মা-বাবা আনন্দে চোখের জল ফেলছে—ছেলেও মার কোলে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছে—এ দৃশ্য দেখলেও পুণ্য হয়। রাতুলদাও দেখি কাঁদছেন ছেলেকে কোলে নিয়ে।

একদিকে মা বাবার স্নেহ—অন্যদিকে ছেলের ভালবাসা—এর চেয়ে স্বর্গীয় দৃশ্য আর কিছু নেই! আমি যে একজন বাইরের লোক, আমাকেও বার কয়েক পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছতে হলো!

কৃষ্ণমূর্তি তার ছেলেকে দু-হাতে মাথার ওপরে তুলে প্রায় নাচতে শুরু করে দিলেন, দু-চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে—তিনি যে একটা দৃশ্য করছেন ভাবাবেগের আতিশয্যে, এই শোভনতাটুকুও বুঝতে পারলেন না। তাঁর ছেলেটাও বাবার স্নেহাশ্রয়ে এসে ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠেছিল!

শুধু রাতুলদা বা কৃষ্ণমূর্তির ঐ অবস্থা নয়, সব মা-বাবার দশাই

প্রায় এক রকম। মিঃ বিশ্বাস বাইরে থেকে খুব বেশী উচ্ছ্বাস দেখালেন না বটে, কিন্তু ছেলেকে আদর করতে ভুললেন না।

সন্তান সকলের কাছেই সমান আদরের বস্তু। বাবা না হলে বোঝা যায় না—অপত্য স্নেহ কি, আর শিশু সন্তান কতটা স্বর্গের আনন্দ নিয়ে সংসারকে খুশিতে ভরিয়ে তোলে!

উত্তেজনা এবং আবেগের প্রথম ধাক্কাটা এমনি ভাবেই সামলানো হলো। এরপর জানার কৌতূহল জাগলো আবার, সকলে আবার মাধু সিংকে ঘিরে ধরতে গেল।

ইতিমধ্যে দারোগাসাহেব আর ত্রিলোচনবাবু মাধু সিং-কে একটু ফাঁকা জায়গায় ডেকে নিয়ে গিয়ে তার কথা শুনছেন, কিছু কিছু লোক সেখানে ভিড় করেছে, আমিও গেলাম সেখানে।

কথা বলার সময় লক্ষ্য করলাম যে মাধু সিং-এরও গলা কাঁপছে কিছুটা আবেগে আর কিছুটা উত্তেজনায়। চোখে পাতা তারও ভিজে গেছে—মা-বাবার সঙ্গে ছেলেদের এই মিলন দৃশ্য দেখে। মাঝে মাঝেই তার গলা কাঁপছিল, তবু নিজেকে সে যথেষ্ট সামলে নিয়ে দারোগাবাবুর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল।

আমি যখন মাধু সিং-এর কাছাকাছি গেছি, তখন দারোগাবাবুর এক প্রশ্নের উত্তরে সে বলছে—ঠিক যে কোথায় গিয়েছিলাম জানি না। তবে ডাকাতেরা আমাদের সবাইকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল।

সে কি? গাড়ী শুদ্ধ?

হ্যাঁ।

এ যে দেখছি হাইজ্যাকিং।

এ অবশ্য বিশ্বাস করার কথা নয়, বিকেলবেলা দশ-দশটা ছেলেসহ আমার মত শক্ত-সমর্থ একজন ড্রাইভারকে বন্দী করা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। তবু গতকাল বিকেলে এই কাণ্ডটা ঘটেছে বাবু। সে যে কী সাংঘাতিক—তা ভাবতে গেলে এখনো গায়ে কাঁটা লাগে—বাবু।

তুমি একটু বিস্তারিত করে বলো, দেখছো না এখানের সকলের আগ্রহ কত—তোমার কাছ থেকে ঘটনাটা জানবার।

এই সময়টুকুর ভেতর অবশ্য অনেক ছেলেই এলোমেলোভাবে গতকাল যা যা ঘটেছে—তার কথা তাদের অভিভাবকের কাছে বলেছে। রাতুলদা-ও তার ছেলের কাছ থেকে সামান্য কিছু জেনে থাকবেন। আমি তেমন কিছু জানতে পারিনি বলেই মাধু সিং-এর মুখের কথা শোনার জন্যে এই দিকটায় এসেছি।

মাধু সিং-এর বলার বিরাম নেই। সে বলছিল—রোটাংডি থানা থেকে বেরিয়ে রোজ যেমন আসি, তেমনি গাড়ী চালিয়ে আসছি, তিলুড়ী হ্রদের কিছু আগে দেখি পথের ওপর আড়াআড়িভাবে একটা বড় ভ্যান পথ আটকে দাঁড়িয়ে। ভ্যানের ধারে-কাছে কেউ নেই, ভ্যানের ড্রাইভারকেও দেখতে পেলাম না, হর্ণ দিলাম, কোনো ফল হলো না। গাড়ী থামিয়ে যেই না নেমে দেখতে গেছি—কেন এমনভাবে পথ আটকে ভ্যানটা রয়েছে—ঠিক সেই সময় আচমকা ওই ভ্যান থেকে কয়েকজন গুণ্ডা প্রকৃতির লোক বের হয়ে এসে আমাকে জাপ্টে ধরলে, কোনো কিছু বোঝবার আগেই আমার মুখ হাত বেঁধে ফেললে, তারপর চ্যাংদোলা করে ভ্যানের এক কোণে চালান করে দিলে। আমি তখন পিছমোড়া করে বাঁধা, হাত পা যেমন অচল, তেমনি মুখ বাঁধা—একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত করতে পারলাম না।

তারপর ?

আমার অবস্থা দেখে ছেলেরা কান্না জুড়ে দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকজন গুণ্ডা ছেলেদের হাত মুখ বেঁধে ফেললে কষে, যাতে তারা চেঁচামেচি না করতে পারে। আমি বুঝতে পারলাম আমরা ডাকাতের কবলে পড়েছি।

এই কথা বলে মাধু সিং একটু থামলো দম নেবার জন্যে, আমি ভিড়ের মধ্যে ইতস্ততঃ তাকালুম মিঃ বিশ্বাসকে দেখার চেষ্টায়, কিন্তু তাঁকে দেখা গেল না। তিনি বোধ হয় তাঁর ছেলেকে নিয়ে রূপজামে-

চলে গিয়ে থাকবেন, দু একটি গাড়ী রূপজামে গেছে—তা আমরা দেখেছি।

ত্রিলোচনবাবু মাধু সিং-কে জিজ্ঞাসা করলেন—কিন্তু স্টেশন-ওয়াগনটা গেল কোথায়?

দম নিয়ে মাধু সিং ফের শুরু করলে—ওই ভ্যানটা ছিল মস্ত। ছেলেদের আর আমাদের ওই স্টেশন-ওয়াগনে পুরে দিলে যেমন করে লরিতে মালের বস্তা তোলে—তেমনি ভাবে। তারপর আমাদের শুদ্ধ্ ওই স্টেশন ওয়াগনটা ভ্যানের মধ্যে পুরে নিলে।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন প্রশ্ন করলে—তার মানে?

মানে খুব সোজা, ডাকাতদের কে একজন এসে স্টেশন-ওয়াগনটা চালিয়ে ভ্যানের মধ্যে তুলে দিলে। ভ্যানের তুলনায় আমাদের গাড়ীটা খুবই ছোট্ট—কাঠের পাটাতন বেয়ে ভ্যানের মধ্যে গাড়ীটা উঠে গেল—অসহায়ভাবে শুধু দেখতে লাগলাম। আমরা সকলে শুধু যে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছি, তা নয়, বাচ্চাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বড্ড কষ্ট বোধ করতে লাগলাম। ভ্যানের দরজা বন্ধ করা হলো, বাইরে থেকে বোঝার উপায় রইলো না যে ভ্যানের ভেতর ছেলেশুদ্ধ্ একটা ষ্টেশন-ওয়াগন পোরা রয়েছে।

কী সাংঘাতিক!

একটু পরেই আমরা বুঝতে পারলাম যে ভ্যানগাড়ীটা চলতে আরম্ভ করলো। চলন্ত ভ্যান যারা বাইরে থেকে দেখবে—তারা কিছুতেই বুঝবে না আমরা বন্দী হয়ে ঐ ভ্যানের মধ্যে চলেছি। আমার বলতে যতটা সময় লাগছে—ভাববেন না এতটা সময় ধরে ঐ সব কাণ্ড হলো। আমাদের বেঁধে ফেলা, ভ্যানের মধ্যে ষ্টেশন-ওয়াগন তোলা—সব ব্যাপারগুলোই যেন মুহূর্তের মধ্যে পর পর ঘটে গেল।

দারোগাবাবু মন্তব্য করলেন—ভ্যানের মধ্যে পুরে এইভাবে

গাড়ীশুদ্ধ, ছেলেদের চুরি করে নিয়ে যাওয়া—এ একেবারে তাজ্জব ব্যাপার !

তাজ্জব কী বাত—বাবু। আমি ত' ভাবতেই পারিনি রোটাংডি রূপজামের মধ্যে দিনের আলোয় আমার গাড়ী চুরি যেতে পারে, ভাবতাম এ আমার এলাকা, আমার জায়গা। কিন্তু গুণ্ডা-বদমাসের দল যে সর্বত্র আসতে পারে—তা ভাবতে পারিনি আগে !

না-ভাববার কিছু নেই। যাক্, তারপর কি ঘটলো বলো—ত্রিলোচনবাবুর গলা শোনা গেল।

আমরা তো ভ্যানে বন্দী হয়ে চলেছি, আমি হতভম্ব, সব বাচ্চাদের চোখে জল—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তারা তখন কাঁদতে শুরু করেছে, মুখ বাঁধা, কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না ;—আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল খুব শক্ত করে, শুধু চোখ দুটো আমার খোলা, বাচ্চাদের মুখগুলোও খুব কষে বাঁধা। তবে ভ্যানের ভেতরটা খুব অন্ধকার। বাচ্চাদের দেখা যাচ্ছে—কিন্তু তাদের কান্না শোনা যাচ্ছিল না, তবু তারা যে কাঁদছিল—সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না, তাদের চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়ে থাকবে।

কোথায় তোমাদের নিয়ে যাওয়া হলো ?

বলছি বাবু : কতক্ষণ ধরে যে গাড়ীটা চললো তা বলতে পারবো না, তবে বেশ জোরেই যাচ্ছিল। গাড়ী যখন থামলো—তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। ভ্যানের মধ্যে থেকে মনে হলো ড্রাইভার গাড়ী থেকে নেমে কাকে ডাকতে লাগলো, আগে দু-একবার হর্ণ বাজিয়েছিল। কোন গেটের তালা খোলার শব্দ পেলাম, তারপর লোহার দরজা খোলারও আওয়াজ কানে এল। ভ্যান গাড়ীটা আমাদের নিয়ে ওই গেট পার হয়ে ভেতরে ঢুকলো। দরজা দিয়ে ভ্যান ঢোকার পর দরজাটা আবার বন্ধ করা হলো, তালা বন্ধ করে দেবার শব্দও পেলাম—ভ্যানের মধ্যে থেকে। ঘেরা জায়গার ভেতরে গাড়ীটা এলে আমাদের টেনে নামানো হলো, আমার হাতের বাঁধন ছাড়া—

আর সব খুলে দেওয়া হলো। ছেলেদের সব বাঁধন খুলে দেওয়া হলো। ছেলেরা আমার অবস্থার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো। কেউ কেউ আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। কাঁদছে দেখে বললাম—কেঁদোনা, চুপ করো। আমার কথায় কোনো কাজ হলো না, বরং যারা চুপ করেছিল—তারা পর্যন্ত কেঁদে উঠলো।

দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—তখন রাত কতো হবে ?

ঘড়ি ত' আমার কাছে ছিল না, তবে রাত বেশী নয়, কেননা বিকেলের আলো মরে গেছে আমাদের যখন ভ্যানে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন। তারপর খুব বেশী হলে না হয় একঘণ্টা সময় যাক। সন্ধ্যে রাত বলা যায়। যাই হোক, ছেলেদের বাঁধন খোলার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম, তাদের হাত-মুখ ধোবার জন্যে জল, প্রচুর খাবারের ব্যবস্থাও রয়েছে। ছেলেরা আমার দিকে তাকাতে লাগলো। আমার কেমন মনে হলো, খাবারগুলোর মধ্যে বিষটিস কিছু মেশানো নেই। আমি ওদের বললাম—মুখ হাত ধুয়ে নাও। খাবারও খাবে, আগে আমি খাবো, তারপর তোমরা ঐ খাবার মুখে দেবে।

একজন লোক এসে আমার বাঁধনও খুলে দিয়ে বললে—যা বেটা, তুইও হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নে। সর্দার তোর বাঁধনও খুলতে হুকুম করেছেন। ছেলেদের কান্না সম্পূর্ণ থামে নি। আমি প্রত্যেকের পিঠে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললাম—এখানে কেঁদে কোনো লাভ নেই, আশেপাশে কোথাও কেউ নেই যে তোমাদের কান্না শুনে ছুটে আসবে। এমন নির্জন জায়গা এটা যে এখানে কাঁদলে বনের পশুও টের পাবে না।

আমি আগে খাবার খেলাম, বড় বড় সামোসা, আলুর পুর দেওয়া, বোধ হয় দালদায় ভাজা, খেতে মন্দ নয়।

যে লোকটা হাত ধোবার জল দিচ্ছিল, সে বললে—ভয় নেই, সর্দারের অর্ডার সব থেকে ভালো সিঙাড়া তোমাদের খাওয়াতে হবে। খাজাও খুব ভালো।

যমদূতের মতো বিশ্রী রকমের একটা লোক এগিয়ে এসে বললে—তোমাকে আমাদের কাজ নেই, সুতরাং তোমাকে আমরা একেবারে মুক্তি দিয়ে দেব। ছেলেগুলোকে আগে পার করি।

ত্রিলোচনবাবু শুধু মন্তব্য করলেন—হরিবল্!

মাধু সিং বলে যেতে লাগলো—আমাকে ওরা যে খুন করে ফেলবে, সে রকম কথা ভ্যানের মধ্যেই শুনেছিলাম। ভ্যানে বন্দী হয়ে আসবার সময়েই গুণ্ডাগুলোর কথাবার্তা থেকে একটু বুঝেছিলাম যে মাত্র দশটা শিকার তারা পেয়েছে—এদের বিক্রী করে মন্দ উপায় হবে না। ড্রাইভার ব্যাটাকে খুন করে পুঁতে ফেলতে হবে। সুতরাং আমাকে যে একেবারে মুক্তি দেবার কথা বলছে, সেই মুক্তির মানে আমার কাছে বেশ পরিষ্কার।

যমদূতের মতো দেখতে ওই লোকটাই নাকি এই ডাকাত দলের সর্দার। সে বললে—ছেলেদের সুস্থ রাখতেই হয় আমাদের, ওদের বিনিময়েই আমরা টাকা রোজগার করি।

কিভাবে টাকা রোজগার করে—তা অবশ্য আমাকে বলে নি। শুধু বলে গেল—কাল তোমার বিচার হবে, কি রকম বাধা তুমি দিয়েছো আমার সাকরেদদের কাল শুনানী হবে।

ত্রিলোচনবাবু দারোগাসাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন—ইণ্টারন্যাশনাল চাইল্ড লিফ্‌টারের দল নাকি? পৃথিবীর সব জায়গায় ছেলেধরার যে দলটা ছড়িয়ে আছে—তাদেরই একটা অংশ?

দারোগাবাবু বললেন—মাধুর কথায় তো এখন সেই রকম মনে হচ্ছে, তবে সবটা আগে শুনে নিই। হ্যাঁ, তারপর থেকে বলে যাও, মাধু।

মাধু সিং আবার শুরু করলে—এ দেশ সে দেশ থেকে ছেলে ধরে এরা নানা জায়গায়—আরব দেশে কি স্পেনে—জানি না কোথায় সেই সব ছেলেদের মোটা টাকার বিনিময়ে বিক্রী করে দেয়।

তা যাই হোক, সন্ধ্যারাতের জলযোগটা ভালই হলো। ছেলেদের

আর আমার—সকলেরই বেশ ক্ষিধে পেয়েছিল। সামোসা খাজা আর বালুসাই। এর পর রাত্রেও আবার ভরপেট খাওয়া, খিচুড়ি আর বেগুন ভাজা। যদিও মৃত্যুর কাছাকাছি এসে পড়েছি, হয়তো কাল সকালে আমার আয়ু শেষ, তবু রাত্রে গরম গরম খিচুড়ি আর বেগুন ভাজা খেতে মন্দ লাগলো না, ভরপেট খেলাম। ছেলেরাও খেল। এই খিচুড়ি খাবার পর থেকেই মাথায় একটা মতলব খেলতে লাগলো। এখান থেকে পালাতে হবে। রাত্রে—আমাদের খাওয়ার পাট চুকে গেলে সকলে আমাদের একটা টিনের শেডের তলায় রেখে চলে গেল। শীতের রাত, ছেলেরা জড়াজড়ি করে মেঝেয় শুয়ে পড়লো, সতরঞ্চ আর চটপাতা রয়েছে মেঝে, সুতির ময়লা চাদর ছিল, ঐ চাদর গায়ে জড়িয়ে ছেলেরা শুয়ে পড়লো। আমার মাথায় তখন ওই এক চিন্তা—কি করে এখান থেকে পালানো যায়, কি করে পালিয়ে গিয়ে বাচ্চাগুলোকে বাঁচানো যায়। আমাদের শেড থেকে একটু দূরে সেই গেট, গেট বন্ধ, তবু সেই গেটের ধারে দুজন লোক বসে বোধ হয় মহুয়ার রস খাচ্ছে তারিয়ে তারিয়ে। মহুয়ার রসও হতে পারে, হাঁড়িয়াও হতে পারে। আমি গুটি গুটি এগিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে ভাব জমালুম। দু-চারটে কথা বলতেই আলাপ জমে গেল। একটু আধটু প্রসাদ পাওয়া যাবে কিনা জিজ্ঞাসা করতেই একেবারে জল হয়ে গেল। অবশ্য এই প্রসাদের বিনিময়ে টাকা দেব, বেশ মোটা টাকাই দেব। এই রকম বলাতে ওই দুজন লোকই হাত পেতে বসলো। টাকা তো সঙ্গে নেই, বাইরে চলো,—তিলুড়ীর কাছে যাবো আর টাকা নিয়ে আসবো এক দোকান থেকে। প্রথমটায় এ প্রস্তাবে তারা রাজী হলো না।

গেট ছেড়ে যেতে তাদের মানা। আমি বুঝিয়ে দিলাম—একজন চলুক আমার সঙ্গে যাবো আর আসবো। কিম্বা আমার ওই স্টেশন-ওয়াগনটা নিয়ে যেতে দাও—ছেলেরা থাক জামিন।

কথায় কথায় তাদের কাছ থেকে জানলাম—এরা কারা। সারা

ভারত কেন, বিশ্বব্যাপী ছেলে-চোরের দলের এক অংশ এটি। এরা এখানে পাহারাদারের কাজ করে—মাস-মাইনের বদলে। এই দলের ব্যবসাই হলো ছেলে চুরি করে পাচার করা, সারা জগৎ জুড়ে ছেলে চুরি করে—এ দেশ থেকে ও দেশে আর, ও দেশ থেকে ভিন দেশে ছেলে পাচার করা।

কোন্ জায়গায় আমরা বন্দী হয়েছি জানতে চাইলে তারা বললে যে—এটা তেলোর জঙ্গল। তেলো আমি চিনি, এখান থেকে চন্দ্রপুরা থানা খুব দূর হবে না, কিন্তু কি করে থানায় যাই—তাই ভাবতে লাগলাম। গেটের দুজনকে টাকার লোভ দেখাতে তারা নরম হয়েছে বটে, কিন্তু রাজী হতে চাচ্ছে না। চোরের দল যা মাইনে দেয়, তা তো খুব বেশী নয়, উপরি কিছু কামাতে হয়,—এই ধরনের কথা বলায় দেখলাম, ওদের একজন বললে—তোমার গাড়ীটা পাশেই আছে, ওটা কাল ভাঙা হবে, ওর স্পেয়ার পার্টসগুলো মাদ্রাজে আর আমেদাবাদে পাঠানো হবে বিক্রীর জন্যে। আমি এও শুনলাম যে এই দুটো লোকের ওপর ভার রয়েছে—কাল সর্দারকে জানাতে হবে—সারা রাত আমরা কি করেছি আর কেমন ভাবে কাটিয়েছি।

চন্দ্রপুরা থানায় গিয়ে এদের লোক রাত ৯টা কি ১০টার সময় খোঁজ এনেছে—সেখানে কোনো খবর এসেছে কিনা, দশটা ছেলে যে চুরি হয়েছে, সে সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে কিনা। জানা গেল—তখনো পর্যন্ত চন্দ্রপুরা থানা এ নিয়ে ব্যস্ত হয় নি।

আমার গাড়ীটার কাছে ওদের একজন নিয়ে গেল, বললে—তুমি চাঁহ খুব চালাক আছো, গাড়ী করে সরে পড়ার তাল করছো, তারপর লোকলস্কর নিয়ে আসবে এখানে। তা হবে না। আমাদের একজনকে সঙ্গে নাও।

বেশ চলো, টাকা আমি বাড়ী থেকে নিয়ে আসবো, কিন্তু গাড়ীটা ফেলে রেখে আসবো—রাস্তায়, গাড়ীর বদলে কয়েক হাজার টাকা তোমাদের দেব, ধরো দশ হাজার।

টাকার লোভ বড় লোভ, নেশাখোর দু-জনের একটা লোক অতি সন্তর্পণে কোমরে রিভলবর একটা গুঁজে নিয়ে আমার সঙ্গে বেরিয়ে গেল। গেটের পাশে ছোট ঘরে দারোয়ান ঘুমিয়ে রয়েছে। দরজা বন্ধ, শীতের রাত।

সঙ্গে সঙ্গেই টাকা পাবে বলে আমাকে বন্দীশালা থেকে বের হতে সাহায্য করলে, গাড়ীটাও দেখিয়ে দিলে, আর আমার সঙ্গে পাশে বসে চলে এল। আমি সোজা চন্দ্রপুরা থানায়, তেলো থেকে চন্দ্রপুরা অল্প রাস্তা। যে আমার সঙ্গে ছিল, সে থানা চিনতো না, সুতরাং আমার মতলব কিছুই আঁচ করতে পারলো না। শীতের রাতে বাইরে থেকে বোঝাও যায় না যে এটা থানা।

থানার সামনে গাড়ী রেখে বললাম—এই আমার বাড়ী, শীগ্‌গিরই আমি টাকা নিয়ে আসছি, তুমি গাড়ীতে বসো। সে বললে—একা আমি বসবো না চাঁদু, তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবো। বেশ তাই চলো,—বলে তাকে গাড়ী থেকে নামালাম।

গেটের মধ্যে ঢুকতে না ঢুকতেই বোধ হয় তার নেশা কেটে গেল, সে বুঝতে পারলে যে সে থানায় এসে পড়েছে। ততক্ষণে আমি চীৎকার করে সেপাইদের তুলে ফেলেছি, সঙ্গীটাকে আগেই জাপ্টে জড়িয়ে ধরে রেখেছি—যাতে ব্যাটা পালাতে না পারে, রিভলবরটা কোমর থেকে বের না করতে পারে। থানায় হৈ চৈ পড়ে গেল। পুলিশ অফিসার বাবুদের সব কথা বললাম। কিছুক্ষণ আগে থানাতেও খবর এসেছে—স্কুলের দশটা ছেলেসহ বাস হারানোর কথা এখানে পৌঁছেচে।

সঙ্গী ব্যাটাকে হাজতে পুরে পুলিশদলের বড় বড় অফিসার এবং ফৌজ জীপ গাড়ী করে তখনই তেলোর জঙ্গলের দিকে বেরিয়ে পড়লাম। স্টেশন-ওয়াগনে চন্দ্রপুরা থানার পাশের একটা জায়গা থেকে তেল নিয়ে নিলাম। রাত তখন প্রায় শেষ হতে চলেছে। আচমকা জঙ্গলের সেই ঘেরা জায়গাটার চারিদিকে পুলিশ মোতায়েন

করেই গেটের দারোয়ানকে পাকড়াও করা হলো, অন্য যে লোকটা দরজার কাছে ছিল, সে ব্যাটা বসে বসে ঝিমোচ্ছিল, কে জানে টাকার স্বপ্ন দেখছিল কি না।

আমি পুলিশ সাহেবকে নিয়ে শেডের তলায় গেলাম। ছেলেদের ডেকে তুলতেই তারা আর এক দফা কাঁদতে শুরু করলো। আমি বললাম—চুপ করো, তোমাদের দুঃখের রাত বোধহয় শেষ হয়েছে। উঠে স্টেশন-ওয়াগনে গিয়ে চেপে বসো—আমরা এবার বাড়ী ফিরবো।

পুলিশ অফিসারেরা খুব যত্ন আর সতর্কতার সঙ্গে ছেলেদের স্টেশন-ওয়াগনে উঠিয়ে দিলেন। মস্ত ওই ঘেরা বাগান আর তার মধ্যে ঘর এবং শেড থেকে জনা-পাঁচেককে শুধু পাকড়াও করতে পারলেন। যমদূতের মত সেই শয়তান লোকটাকে পাওয়া গেল না, সে গা ঢাকা দিয়েছে, জঙ্গলের মধ্যে অন্যেরাও পালিয়ে থাকবে। ভোরের আলো ফুটতে জঙ্গলের কিছুটা খোঁজ করা হলো, দেহাতী মানুষজনকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল—অনেক দিন ধরেই এই জঙ্গলে ওই বাগানটা ঘেরা হয়েছে, ওখানে গোপনীয় কাজ কারবার হয়—স্থানীয় লোকেরা তা জানে না।

ডাকাত সর্দার পালিয়েছে—তবে তার প্রধান সাকরেদ দুটো ধরা পড়েছে—চন্দ্রপুরা থানার বাবুরা এতেই খুব খুশী। ওদের কাছ থেকে এই ডাকাতদলের নাড়ী-নক্ষত্র সব জানা যাবে।

তেলো থেকে চন্দ্রপুরা থানায় কেস লিখিয়ে দিয়ে এই তো এসে হাজির হলাম।

এরই ভেতর কখন যে বৃদ্ধ তিন্নু সিং এসে হাজির হয়েছে—তা আমরা টের পাইনি। সে ভিড়ের মধ্যে থেকে এগিয়ে সামনের দিকে এসে বেশ গর্বের সঙ্গে বলে উঠলো—সাবাস বেটা, সাবাস! আমি জানতাম—তুই হারাবি না, অন্যেরও কিছু খোয়াবি না। প্যাট খেলা দেখাতো আর বলতো—জগতে কিছু হারায় না, কুচ্ ভি খোয়া যায় না…
